উপস্থিত হইল। তীর্থিকগণ মহামারীশান্তিতে অসমর্থ হওয়ায় লিছাধগণ বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধ অবিলম্বে তাহাদের রাজধানী বৈশালীনগরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে মহামারী উপশমিত হইল। ফলে লিছাধগণ বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠাসনে বরণ করিয়া লইল।

তথাগত রাজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া উপর্যুপরি তিন বৎসর কাল বেণুবনে অবস্থান করিলেন। পঞ্চমবর্ষায় তিনি বৈশালীর উপকণ্ঠে মহাবনে কুটাগারশালায় গমন করিলেন। এই সময়ে শাক্য ও কোলিয়গণের মধ্যে একটি বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাক্য এবং কোলিয়রাজ্যকে পৃথক করিয়া রোহিণী নদী প্রবাহিত হইতেছিল। জলের অল্পতাবশতঃ উভয় রাজ্যের চাষোপযোগী জল দিতে এই ক্ষুদ্র নদী সমর্থ ছিল না। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইল। এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধ তথায় গমন করিলেন। তাঁহার উপদেশে সকলে জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তাঁহার বাণীতে অমৃতত্বের সন্ধান পাইয়া বহুলোক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল।

শুদ্ধোদনের অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া বুদ্ধ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। মুমূর্ষু পিতা তাঁহার উপদেশ শুনিতে শুনিতে তনয়কে চতুর্থবার প্রণাম করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

ষষ্ঠবর্ষা শ্রাবস্তিনগরে অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।* অষ্টমবর্ষায় তিনি ভর্গরাজ্যে † গমন করেন। অবন্তিরাজকুমার যুবরাজ বোধি এই সময়ে ভর্গরাজ্যে নবনির্ম্মিত কোকনদ নামক প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তিনি বুদ্ধের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বভবনে আমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে প্রাসাদের দ্বিতলে উঠিবার সোপানাবলীতে বহুমূল্য বস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধ উহার উপর দিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। বস্ত্র অপসৃত হইলে তিনি যথাস্থানে গমন করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। আহারান্তে উপস্থিত সকলকে সদুপদেশ দান করিয়া স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বর্ষান্তে তিনি শ্রাবস্তিনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদঞ্চলে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া দ্বাদশবর্ষায় তিনি বৈরস্তিনগরে গমন করেন। বর্ষাশেষে তক্ষশিলা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া সংকাশ্য, কান্যকুব্জ ও প্রয়াগ হইয়া তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন। মজ্ঞবাদের করগত সীমানায় বুদ্ধের প্রবেশ ইহাই প্রথম এবং শেষ। তথাগতের আহ্বান সেখানে কার্য্যকরী হইল না। অন্তরদ্বার যেখানে বজ্রঅর্গলে রুদ্ধ, মর্ম্মবাণী সেখান হইতে প্রতিঘাত মাত্র লইয়াই ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষা শ্রাবস্তিতে অতিবাহিত করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষার শেষভাগে তিনি পুনরায় কপিলবস্তুতে গমন করিলেন। গৌতমের গৃহত্যাগ হেতু যশোধরাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া সুপ্রবুদ্ধ জামাতার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুপ্রবুদ্ধের পুত্র দেবদত্তও গৃহত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল। বুদ্ধের কঠোর শাসন তাহার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। সুপ্রবুদ্ধের ক্রোধ ক্রমে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি এইবারে গৌতমের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিলেন। ফলে সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।*

বিংশ বর্ষান্তে বুদ্ধকে অঙ্গদেশে গমন করিতে হইল। অনাথপিণ্ডিক অঙ্গদেশস্থ এক প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বণিকপরিবার আজীবকমতাবলম্বী ছিল। নববধূর ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। ইহাদের আহ্বানে পঞ্চশত শিষ্যসহ বুদ্ধ তথায় গমন করিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণীতে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পরিবার সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিল। অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে রাখিয়া তিনি শ্রাবস্তিনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তথাগতের বয়ঃক্রম যখন ৭২ বৎসর, দেবদত্ত তখন সাক্ষাৎভাবে বিদ্রোহী হইলেন। স্বমতাবলম্বী একদল ভিক্ষু সহ তিনি পৃথক সঙ্ঘ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রু পিতাকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অজাতশত্রুর সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পিতৃবধের অনুতাপে অজাতশত্রুর মনে শান্তি ছিল না—সে নির্ম্মম স্মৃতি নিরন্তর অন্তরকে মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে তিনি জীবকের

* বৌদ্ধ কথক বলেন ষষ্ঠবর্ষায় বুদ্ধ একবার ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে স্বীয় জননী মায়া দেবীর নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে গমন করেন। তিন মাসকাল তিনি তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের জন্য ধরায় তিনি তাঁহার অনুরূপ একটি মায়াশরীর রাখিয়া যান। স্বর্গ হইতে তিনি সাংকশ্য নগরে অবতরণ করেন। অবতরণকালে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত তিনটি সিঁড়ি নির্ম্মিত হয়। মধ্যের সোপানাবলী বহিয়া বুদ্ধ, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শক্র অবতরণ করেন। see M. of B.—Ken pp. 33. for another interesting version see M. of B, Hardy, 302 ft

† বর্ত্তমান এলাহাবাদের অনতিদূরে। এই রাজ্য বৎসা রাজ্যের অধীন ছিল। see Pol. Hist of Anc. ind Dr. Raychaudhuri—pp. 98.

* আখ্যানকথক বলেন পাতালস্থ অবিচী নামক নরকে সুপ্রবুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

উপরোধে শান্তির আশায় তথাগতের সমীপস্থ হইলেন। শান্তি মিলিল—অজাতশত্রু বুদ্ধকে হৃদয়াসনে গ্রহণ করিয়া লইলেন। *

তথাগতের বয়ঃক্রম ৭৯ বৎসর। নালন্দা, পাটলিগ্রাম প্রভৃতি পরিক্রম করিয়া তিনি পুনরায় বৈশালী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আম্রপালীর আম্রবনে উপনীত হইবামাত্র উক্ত বারনারী সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে বারাঙ্গনার অন্তর নিষ্কলুষ হইল। দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া সে আম্রবন সঙ্ঘকে দান করিল এবং সশিষ্য বুদ্ধকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিল। আমন্ত্রণ গৃহীত হইল। ক্ষণপরেই লিচ্ছবি রাজগণ আসিয়া বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিক্ষা-গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তথাগত তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বুদ্ধের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া আম্রপালীর অন্তর আজ হঠাৎ উৎসবে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত দিবস কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি হৃদয়ে এক লোকাতীত আনন্দ অনুভব করিলেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধ-শাবকগণের সেবা করিয়া তিনি নিজকে ধন্যা জ্ঞান করিলেন। আম্রপালী সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের স্বহস্তে দীক্ষিত শেষ উপাসিকারূপে পরিগণিতা হইলেন।

তাঁহার সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎ উপাসক হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল মন্দভাগ্য (!) চুন্দের। বেলুব, মহাবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে তথাগত মল্লরাজধানী পাবানগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কর্ম্মকার চুন্দ জগৎপাবনকে স্বগৃহে অতিথিরূপে পাইয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিল। :আপনার শ্রেষ্ঠ উপাদেয় খাদ্য শূকরমাংসে সে সোল্লাসে অতিথিসৎকার করিল। হতভাগ্য জানিতেও পারিল না যে তাহারই বিষম ভ্রমে তাহার প্রিয়তম কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। †

পুরুষতর্পণ।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ মহাপুরুষদিগের নামে, তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে এখানে এসেছি। মহাপুরুষের কথা বল্লেই মার্কিণ মহাকবি লংফেলোর কবিতাটী মনে পড়ে, যা আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—সেই জীবন-গাথা—সেই Psalm of Life। এমন সুন্দর সার কথা এত অল্পের ভিতর জগতের সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। ঐ মহাকবি ঐ গাথায় বলেছেন যে মহাপুরুষদের স্মরণ করা চাই, তাঁদের জীবন আলোচনা করা চাই—কেন চাই? তাঁহাদিগকে স্মরণ করলে, তাঁদের জীবন আলোচনা করলে, তাঁদের মহাপুরুষত্বের কারণ ও লক্ষণ সকল আমাদের জীবনের ভিতরে মিশিয়ে নিলে, আমরাও যে তাঁদের পথে চলতে পারব, মহাপুরুষের পদ অধিকার করতে পারব। মহাপুরুষত্ব কারও নিজস্ব নয়। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভগবান আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে আছেন—তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রেম, তাঁর শক্তির এক কণাও যিনি অন্তরে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, তিনিই স্বভাবতই মহা-পুরুষের স্থান অধিকার করবেন। অন্যান্য দেশে সভাসমিতি করে মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করা হয়; আমাদের দেশে ধর্ম্মের সহযোগে তর্পণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষেরও স্মরণ করবার বিধান আছে। আমরা বিদেশীয় সাহিত্যে বীরপূজার উপদেশ পেয়ে তবে সে বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হলুম এবং তখন নিজেদের দেশে কিরকম বীরপূজা প্রতিষ্ঠিত আছে, তার সন্ধান করতে উদ্যত হলুম। সন্ধান করতে গিয়ে দেখি—আশ্চর্য্য প্রণালীতে ঐ ধর্ম্মের সহযোগে এদেশে বীরপূজা চির-প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মমন্দির যাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি, যাঁর অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর বীরপূজা এনে নবতরভাবে নূতনতর প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহাই নববিধান। আমরাও যদি বীরপূজার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু উপলব্ধি করে ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ভক্তিবীর, কর্ম্মবীর মহাপুরুষদিগকে

---

* এই সময়ে কোশলরাজ বিরূঢক কর্ত্তৃক কপিলাবস্তুর ধ্বংস সংসাধিত হয়। মহারাজ প্রসেনজিতের এক সময়ে ইচ্ছা হয় গৌতম-বুদ্ধের পিতৃবংশের সহিত আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শাক্যরাজসমীপে তিনি কোন শাক্যকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন। শাক্যগণ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠবংশজাত মনে করিতেন বলিয়া কোশলরাজের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন গ্লানিকর বিবেচনা করিলেন। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ কোশল-নৃপতির অনুরোধ উপেক্ষা করিবার মত বল তাঁহাদের ছিল না। অতএব তাঁহারা এক কৌশলের আশ্রয় লইলেন। শাক্যরাজ মহানামের ঔরসে ও এক দাসীকন্যার গর্ভে বাসবক্ষত্রিয়ার জন্ম হইয়াছিল। মহানাম উঁহাকে শাক্যকুমারীরূপে প্রসেনজিতের হস্তে অর্পণ করেন। বাসবক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিরূঢকের জন্ম হয়। কোন সময়ে শাক্যরাজ্যে গমন করিলে, শাক্যগণ বিরূঢকের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করেন। বিরূঢক শাক্যগণের নীচ কৌশল অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শান্তিকামী বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। বহু সৈন্যবলসহ তিনি কপিলাবস্তু আক্রমণ করিয়া শাক্যবংশ নির্ম্মূল করেন। ফিরিবার পথে আকস্মিক বন্যাস্রোতে বিরূঢকের প্রাণত্যাগ হয়।

† সঙ্গে আগত অনুচরবর্গকে বুদ্ধ এই মাংস গ্রহণ করিতে দেন নাই। চুন্দের প্রাণে আঘাত লাগিবে বলিয়া নিজে তাহার অংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গত ২৫শে পৌষ "মহাপুরুষস্মরণে"র দিবসে বিবৃত।

অন্তরাসনে বসাতে পারি, তাঁদের জীবনবেদের উপদেশগুলি যথার্থই অন্তরে গ্রহণ করতে পারি, তবে তো আমাদের দুর্লভ মানবজন্ম সফল হয়ে গেল।

আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি—জড় পদার্থ হয়ে, জড়-যন্ত্র বা machine হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্বের বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁরই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদিগকে এই সংসারে পাঠিয়েছেন। তাঁর কোন্ লক্ষ্য, কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠিয়েছেন, তাহা জানি না বটে, সকল সময়ে তাহা আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয় না বটে, কিন্তু এটা স্থির জানি যে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা মঙ্গলকার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা যদি জীবনটাকে যথার্থতার পথে না চালাই; অসৎপথে চলে, অন্যায় কার্য্যসমূহে নেমে আমরা যদি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে, বিনাশের পথে না নিয়ে চলি, তবেই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য, আমাদের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজ আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে। ফুলের কুঁড়ি যেমন আস্তে আস্তে ফুটে উঠে প্রস্ফুটিত ফুলের আকার ধারণ করলেই সুগন্ধে লোকসকলকে আনন্দিত করে, স্বীয় সৌন্দর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করে, তেমনি আমরাও যদি আমাদের জীবনে দুশ্চিন্তা দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি পাপকীট সকল প্রবেশ করিয়ে, ফুটবার পূর্ব্বেই তাকে বিনষ্ট না করি; আমরা যদি আমাদের জীবনকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে সুভাবে সদ্ভাবে ফুটে উঠতে দিই, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে, তবেই আমাদের জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে, জগতের উন্নতির পথ খুলে দেবার কাজে, মুক্তির পথপ্রদর্শনে লেগে যাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেমন জড় পদার্থও নই, তেমনি জড় যন্ত্রও নই যে, একটা কাঠি খুলে দিলুম, আর যন্ত্র চলতে লাগল—যে পথে তাকে চালালুম—ভাল হোক বা মন্দ হোক—সে চল্ল। আমাদের অন্তরে ভগবান আত্মা বলে একটা কিছু দিয়েছেন এবং কি আশ্চর্য্য উপায়ে কি সুন্দর প্রণালীতে সেই একবিন্দু আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি সকলই দিয়ে আমাদিগকে তাঁর সঙ্গে সমধর্ম্মী করে তুলেছেন। কি আশ্চর্য্য সে জ্ঞান, যার বলে আমরা চেষ্টা করলে, উপযুক্ত সাধন করলে ইহলোকের ও পরলোকের গভীর তত্ত্বসকল জানতে পারি। কি আশ্চর্য্য সে প্রেম, যার বলে এনে বুদ্ধদেব চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সমস্ত জগতকে ভারতের বক্ষে টেনে আনতে পেরেছিলেন। আমরা জড় নই জেনে আমাদের শুভকর্ম্ম করে যেতে হবে। নিশ্চল অলসভাবে জীবন কাটালে সে আত্মাকে জীবিত বলা যেতে পারে না, সে আত্মা মৃত।

আত্মা যতই মৃতপ্রায় হউক, সে মৃত জড়ে পরিণত হতে পারে না—ভগবানের আগুন তার ভিতর ওতপ্রোতভাবে নিহিত আছে—উপযুক্ত ইন্ধন পেলেই তার নির্জীব ভাব, তার নিশ্চেষ্টতা চলে যায়। মহাপুরুষদের স্মৃতিই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি, যার স্পর্শমাত্রে আত্মা সজীব হয়ে উঠে, আত্মা জাগ্রত হয়ে নব জ্ঞান, নব প্রেম ও নব শক্তি লাভের পথে ধাবমান হয়। মহাপুরুষদের স্মৃতি, তাঁদের জীবন, আমাদিগকে স্পষ্ট বলে দেয়, দেখিয়ে দেয় যে আমাদের হাওয়ার উপরে চল্লে চলবে না, আমাদের জীবন শূন্যগর্ভ একটা বৃথা স্বপ্নমাত্র নয়—আমাদের জীবন একটা মস্ত সত্য পদার্থ, আমাদের জীবনের একটা বড় রকমের দাম আছে। এর সাক্ষী এই যে, আমরা সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে চল্লে আমরাও আমাদের পরিপার্শ্বস্থ শত সহস্র লোককে সেই পথে পরিচালিত করতে পারি।

আমাদের জীবনে সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব, বিপদ-সম্পদের সংগ্রাম তো লেগেই আছে। তার জন্য তো ভয় করলে চলবে না। কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে চলবে না। যদি আমরা আমাদের জীবনকে বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনের মত গড়ে তুলতে চাই, তবে প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যে জাগরণভেরী বাজিয়ে দেন, সেই ভেরীর তালে তালে আমাদের প্রাণের ভিতর, আমাদের আত্মাতে যে বীরভাব জেগে ওঠবার অবসর খুঁজছে, তাকেই আরও—আরও—আরও জাগিয়ে তুলতে হবে; আর আমাদের প্রাণের এক কোণে যে কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে এবং সময়ে সময়ে উঁকিঝুঁকি মারে ও বাহির হবার চেষ্টা করে, সেই কাপুরুষতা ও তাহার অনুচর-সহচর শতবিধ বিভীষিকাকে পায়ে দলে ফেলতে হবে। ভগবানের পতাকার তলে দাঁড়িয়ে তাঁর কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে নির্ভীকহৃদয়ে অগ্রসর হওয়ার মত সুখের বিষয় আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। জনসাধারণের অন্তরে নির্ভীকতা, স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথে চলিবার সাহস প্রতিষ্ঠিত করা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। মহাপুরুষদের জীবন আমাদিগকে এই কথাই শিক্ষা দেয়। মহাপুরুষদের জীবন আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, আমাদিগকে কোন প্রকার দ্বন্দ্বের কোন প্রকার বিবাদের অধীন হলে চলবে না। সকল দ্বন্দ্বের, সর্ব্ববিধ বিবাদের অতীত হয়ে তাদের উপরে উঠে কাজ করে যেতে হবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না। সর্ব্ববিধ পরা-

ধীনতার উপরে উঠতে হবে। স্বাধীনতাই হোল মহাপুরুষদের জীবনের কেন্দ্র। আমরাও যদি স্বাধীনতার ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারি, আমরাও তখন মহাপুরুষের পদবীতে উন্নীত হতে পারি এবং জনসাধারণের পূজা আকর্ষণ করতে পারি। স্বাধীন না হলে মহাপুরুষত্ব-লাভের আশা বৃথা দুরাশা।

প্রকৃত স্বাধীন মহাপুরুষ নিজের শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন। স্বাধীনতার অর্থই হোল আত্মনির্ভর। আত্মনির্ভর যাঁর সম্বল, স্বাধীনতা যাঁর প্রাণ, তিনিই মহাপুরুষ। তাঁর কোনও অভাব থাকে না বলেই বিশ্বজগত তাঁর সেবা করতে অগ্রসর হয়। এই কারণেই আমরা সাধু যোগী মহাপুরুষদের চরণে সর্ব্বদাই আত্মবিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকি। আত্মনির্ভর যাঁর সম্বল সেই স্বাধীন পুরুষ সংসারের ভয়ে মিথ্যা বলেন না; সত্য কথা, সত্য চিন্তাই তাঁর একমাত্র ধ্যেয়; সকল বিষয়ে তিনি সত্যের পথেই চলেন; কোন বিষয়েই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হন না। স্বাধীন মানবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ নির্ভীকতা। পরের নিকটে কোন কিছু প্রত্যাশা না থাকলে তো নির্ভীকতা আপনিই আসবে। সুখসম্ভোগ যখন তোমার করায়ত্ত হবে, তখন তাহাতে উচ্ছ্বসিত হয়ো না, পাগল হয়ে যেয়ো না; দুঃখবিপদের অন্ধকার যখন তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তখন তাহাতে তিলমাত্র বিচলিত হয়ো না। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে, প্রতি মানবের জীবন নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বন্দ্ববিবাদের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া ব্যক্তিগত মানবেরও উদ্দেশ্য নয়, মানবসমাজেরও লক্ষ্য নয়। প্রতি মানবের, প্রতি মানবসমাজের, বিশ্বজগতেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখা যায়, পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া। সমস্ত জ্ঞানকে, সমস্ত প্রীতিকে, সমস্ত শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে, সংহত করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে হবে, সমস্ত স্বাধীনতার একমাত্র মূল উৎস ভগবানের চরণে পৌঁছতে হবে, তবেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি সকলই চরিতার্থতা লাভ করবে।

স্বাধীতার অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, কথায় কথায় বিপ্লবের সূচনা করা নয়। প্রকৃত স্বাধীনতার পরিণামে মঙ্গলসাধনে মতি হবে, সত্যসাধনে ব্রতী হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ধর্ম্মের উপর দাঁড়াতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা মিথ্যাভিত্তি অধর্ম্মের সঙ্গে কখনই মিশতে পারে না। মিথ্যা থেকে যত অত্যাচার, যত অনাচার, যত অধর্ম্ম সকলেরই উৎপত্তি এবং তার পরিণামে পরাধীনতার কঠিন নিগড়বন্ধন।

মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ যেমন ব্যক্তিবিশেষের, সেইরূপ সমাজেরও জীবনের লক্ষণ। বাল্মীকি যখন দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ঋষি হলেন, তখন তাঁর আত্মা যে সজীব ছিল এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজও যে সজীব ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে সমাজ ঋষিদের জন্ম দিয়েছিল, সে সমাজ যে জীবনে টগবগ করত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমাজে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ নিশ্চয়ই প্রাণবান ছিল। সেইরূপ ইহাও আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, যে সমাজে শতাব্দীর মধ্যেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ প্রভৃতি আত্মত্যাগী জ্ঞানবীর, ধ্যানবীর, ভক্তিবীর, কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ সমুত্থিত হতে পেরেছেন, সে সমাজ নির্জীব বা প্রাণহীন ছিল না এবং নয়ও—বরঞ্চ ঐ সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমাজের প্রাণের, জীবনের সম্যক পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। অন্য দেশের কথা আমরা তেমন জোরের সঙ্গে না বলতে পারি, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখি যে, এখানে প্রধানত ধর্ম্ম নিয়েই যত কিছু সংস্কার, যত কিছু সংগ্রাম ঘটেছে। ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট সংগ্রামের ফলেই ভারতে বৈদিক ঋষিদের আবির্ভাব; ইহারই ফলে কপিল ও পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রকাশ; ইহারই ফলে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ; ইহারই ফলে বুদ্ধদেব ও অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেব, গুরুনানক ও গুরুগোবিন্দ; এবং ইহারই ফলে রাজা রামমোহন অবধি আচার্য্য শিবনাথ পর্য্যন্ত এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কত না মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ভারতের প্রতি ধূলিকণাকে পবিত্র করে তুলেছেন।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁদের অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করছেন। আমরা যদি তাঁদের প্রতি সত্যই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে চাই, তবে সত্যের পথে শুভকর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়ে তাঁদের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করতে হবে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কল্যাণকর ও শুভদায়ক সকল বিষয়েই উন্নতির উচ্চতম শিখরভূমি অধিকার করতে হবে। সত্য সত্য যদি এইরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সংসারপথে চলি, তবেই মহাপুরুষদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে; তবেই আমরা নিজেদের সঙ্গে পরিবারের, সমাজের, দেশের ও বিশ্বজগতের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সক্ষম হব এবং ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করব।

বেদগান।

মিশ্র ভৈরবী—তাল ফেরতা—একতালা ও তেওরা।

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা'মৃতং গময়
অবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যাম্

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধারেতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও চরণে তব শরণ দাও
দেব হয়ে দখিণমুখ করি' দূর যতেক দুখ
রক্ষা কর রুদ্র মোরে রক্ষা কর নিত্য মোরে।

গান, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

একতালা

২´ ৩ ০ ১ ২´
I সসা সা -া। সর্সা -া র্সা। সর্সা সর্সা সর্সা। -া সর্ঋা -া I ঋা -া ঋা।
অ স তো ০ মা০ ০ সদ্‌ গম য় ত মসো ০ মা০ ০ জ্যো ০ তির্

৪ ০ ১ ২ ৩
। ঋর্ঋা ঋর্ঋা ঋা। ঃ ঋা ঃ সর্জ্জা ঋর্ঋা। -া সর্সা র্সা I র্সা জ্জা র্জ্জা। র্জ্জা -া -া।
গ ম য় মৃ ত্যো ০ র্মাঽ ০ ০ মৃ তং ০ গ ম য় আ ০ বি রা০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০
। র্জ্জা র্রা র্জ্জা। র্জ্জঋা -া ঋা I ঋা -া ঋা। ঋা -া -া। ঋা র্সা ঋা।
বী ০ র্ম এ ০ ধি আ ০ বি রা ০ ০ বী ০ র্ম

১ ২´ ৩ ০ ১
। র্জ্জা ঋা র্সা I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া -া। ণণা ণা -া। দদা -া -া I
এ ০ ধি রু দ্র য ত্তে ০ ০ দক্ষি ণং ০ মুখং ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I জ্ঞা -া মা। পা -া -া। মপা দা দদা। দা -া -া I দা পা দা।
তে ০ ন মাং ০ ০ পা০ ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০ তে ০ ন

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্সা -া -া। ণা দা দদা। পা -া -া I জ্ঞা রা জ্ঞা। জ্ঞমা -া -া।
মাং ০ ০ পা ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০ তে ০ ন মাং০ ০ ০

০ ১
। জ্ঞা ঋা জ্ঞঋা। সা -া -া I
পা ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০

তেওরা

১´ ২ ৩ [পদপা] ১´ ২ ৩
{ I মা ᵍমা মা। পা -া। পা মা I পা র্সা র্সা। ণা দা। দা পা I
অ • সৎ হ • তে • দে • ব তু • মি •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I পা ᵐপা জ্ঞা। পা ᵐপা। দা পা I ᵐজ্ঞা -া মা। জ্ঞা ঋা। সা মা I }
স • ত্যে ল • য়ে • যা • ও মো • রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{ I দা দা মা। দা -া। দা ণা I ণা র্সা র্সা। র্ঋা ণা। র্সা -া I
আঁ ধা • রে • তে • দে • ব তু • মি •

১´ [দা র্জ্ঞা] ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা র্রা। র্জ্ঞা : র্রঃ। র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা -া র্জ্ঞা। র্জ্ঞর্ঋা -া। র্সা ণা I }
দে খা • ও • হে • জ্যো • তি মো • রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I না র্সা র্সা। র্ঋা -া। র্সা র্ঋা I র্সা ণা ণদা। ণা দা। পা -া I
মৃ • ত্যু হ • তে • দে • ব• তু • মি •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা ᵐপা জ্ঞা। পা ᵐপা। ᵖদা পা I ᵐজ্ঞা -া জ্ঞা। ᵍঋা -া। সা ঋা II
পা রে • ল • য়ে • যা • ও মো • রে •

১´ [পা মা মা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
{ I ᵍমা -া মা। মাঃ জ্ঞঃ। মা -া I পা পা -া। দা মা। পা -া I
স্ব • প্র কা • শ • প্র কা • শ • হ ও

১´ ২ ৩ ১´ ২ [পা -া] ৩ [নর্সা দা দা।
I দা দা দা। দা -া। দা ণা I ᵖণা দা দা। পা মা। পাঃ দঃ I} দা -া ণা।
চ র পে ত • ব • শ র ণ দা • • ও দে • ব

২ ৩ ১´ ২
না -া। র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা র্ঋর্সা না।] ৩ ১´ ২
। দা ণা। দণা র্সর্ঋা I র্জ্ঞা র্ঋা র্সা। র্সর্ঋর্সা ণা। র্সা -া I নর্সা দা -া। না র্সা।
হ • য়ে • • • দ খি ণ মু • • • থ • ক • রি • দু •

৩ ১´ ২ ৩ [-া] ১´ ২
। র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞর্ঋা -া। র্সা র্ঋা I} না র্সা র্সা। র্সর্ঋা -া।
র • য তে ক ছু • খ • র • ক্ষা ক •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। র্সা র্ঋা I র্সা ণা ণদা। ᵖণা দা। পা -া I পা ᵐপা জ্ঞা। পা ᵐপা।
র • রু • দ্র • মো • রে • র • ক্ষা ক •

৩ ১´ ২ ৩
। ᵍদা পা I জ্ঞা রা মা। জ্ঞা ঋা। সা মা IIII
র • নি • ত্য মো • নি রে •

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়নাথ দাস)

(২)

রাম শর্ম্মার রচিত "শেষ দিন" (The Last Day) নামক দীর্ঘ কবিতাও মৌলিক রচনা। "সুমেরুর স্বপ্নে"র ন্যায় ইহাতে-ও স্বপ্নোত্থিত ঘটনাবলীর চিত্র কবির তুলিকা অঙ্কিত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কবিবর রামশর্ম্মা স্বপ্নে দেখিলেন যেন প্রলয় কাল সমুপস্থিত। চিত্রগুপ্ত যমরাজার সম্মুখে বসিয়া আছেন, প্রেতাত্মারা একে একে সেখানে চলিয়াছে। সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত পুণ্যাত্মা মানুষ জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকে কবি সেখানে দেখিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মাত্মাগণকে সম্বোধন করিয়া আকাশ-বাণী হইল,—"ভগবদ্-ভক্তগণ, কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ। তোমরা স্বর্গে যাও, সেখানে চিরকাল দেবতাদের সহিত বাস কর"। কবি দেখিলেন উর্দ্ধদিকে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিসকল চলিয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়া কবি দ্বিতীয় সর্গে স্বপ্নে দৃষ্ট চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে পাপাত্মাগণের ঘৃণিত কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কবি তাহাদের দৈবাদেশে নরকবাস হইবে শুনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ করিয়াছেন। "সুমেরুর স্বপ্ন"-রচয়িতার ন্যায় রামশর্ম্মাও "শেষ দিনে"র নীতি-কথা কবিতার শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আলোচ্য কাব্যের শেষে কবির টীকাপাঠে জানা যায় যে, তিনি রাজা রামমোহন রায়, লালাবাবু, ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, লর্ড ক্যানিং, স্যার জামসেটজি, জিজিভাই রাও, স্যার সালার জঙ্গ, হুবার্ট লাইট, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, ডাঃ হেষ্টি, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী ও মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ইসারায় নামোল্লেখ উক্ত কাব্যে করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, হিন্দুধর্ম্মের মতে যাঁহারা যথার্থ যোগী তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শের সহিত কবি খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত আদর্শের তুলনা করিয়া উক্ত টীকায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মূলতঃ এই দুইটী ধর্ম্ম এক। খৃষ্টধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বিবিধ অনুষ্ঠানের উপর গঠিত তাহা রামশর্ম্মা বাইবেল হইতে উদ্ধৃত বহু শ্লোক দ্বারা, খৃষ্ট ও খৃষ্টানগণের জীবনী হইতে ও এই দুইটী ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বাদি হইতে রূপকের আবরণ সরাইয়া আশ্চর্য্যভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

মিল্টনের "প্যারাডাইজ্ লষ্ট" ও "প্যারাডাইজ্ রিগেণ্ড" বুঝিতে গেলে বাইবেলোক্ত ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত জানা দরকার। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের "সুমেরুর স্বপ্ন" ও রামশর্ম্মার "শেষ দিন" বুঝিতে গেলে কিন্তু শুধু খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিলে চলে না, সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব ও পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-জগত হইতে-ও দত্ত কবি ও রাম-শর্ম্মা এত বেশী আলঙ্কারিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাব্যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, যাঁহারা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে এই দুইজন হিন্দু কবির রচিত প্রধান কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, কাব্য-সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহাতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় শশীচন্দ্র ও তরু-দত্ত য়ুরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামশর্ম্মা ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অলঙ্কারের খাতিরে বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যের ভাষা-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহারা য়ুরোপীয় আদর্শের দাস, তাঁহাদের কাব্যে বিদেশী প্রভাব ছাড়া স্বদেশের প্রভাব অনুভূত হয় না, এই প্রকার অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা এই প্রতিভাশালী কবিগণের রচিত প্রধান কাব্যগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধু কবি ও তরু দত্তের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কবি শশীচন্দ্র ও রাম শর্ম্মা তাঁহাদের সমসাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবের অভাব ও তৎসঙ্গে প্রাচীন আদর্শ হইতে তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত দেখিয়া ভারতবাসীর অবনতির কারণ অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিয়াছিলে যে, ধর্ম্মের নামে হিন্দুসমাজে অধর্ম্ম অনাচার ও ভণ্ডামি প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবনী শক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর কবিহৃদয় দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন পাশ্চাত্য-মোহী বাঙ্গালী রাক্ষসের দলকে লঙ্কার ট্রাজিক্ রণক্ষেত্রে যেভাবে ধ্বংস করিয়াছেন "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আধুনিক বঙ্গভাষার একমাত্র মহাকবি মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুকে হিন্দু আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র বাঙ্গালীর ন্যায় দুর্ব্বল হইলেও স্বধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন ও দেব দানব-জয়ী রাক্ষসকে পরাভূত করিয়াছিলেন। "সুমেরুর

স্বপ্নে” হিন্দুকবি শশীচন্দ্রও দর্পান্বিত হিন্দু দেবদেবী-গণকে দর্পহারী বিশ্বদেবতার বিচারাধীন করিয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মের নামে কেবলমাত্র আস্ফালন ব্যতীত যখন আর কিছুই দেখা যায় না, তখন বিশ্বের অন্তরতম স্থান হইতে ন্যায় ও সত্যের সামান্য একটুখানি আলোক শতসূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া দর্পকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। বাস্তবিক, হিন্দু কবি শশীচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুয়ানীর সর্ব্বাঙ্গে স্বার্থপর চিকিৎসা-জনিত দুষ্টব্যাধির সংক্রামক প্রভাব সম্বন্ধে যেরূপ নির্ভীকতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মান্ধ সমালোচনা হয়ত এই প্রকার সত্যবাদিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবে; কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মানুসন্ধানের অভাবে বর্ত্তমান যুগে হিন্দুয়ানীকে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কবিদিগের উক্তির মূলে যে অপ্রিয় সত্য সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী সমালোচকের পক্ষপাতদোষে দুষ্ট সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী সমালোচকগণের মস্তিষ্ক এমন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা বাঙ্গালী কবির রচনায় বিদেশী গন্ধ ছাড়া কোনও কিছুর সৌরভগ্রহণ করিতে পারেন না।

রামশর্ম্মা “শেষের দিনে” ও একাধিক খণ্ড-কবিতায় তাঁহার সমসাময়িক বিস্তর উদারহৃদয় হিন্দুসমাজ-সংস্কারকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালার নৈতিকজগতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে এদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু কবিদিগের মধ্যে সাম্য স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তাহার মূলে স্বদেশহিতৈষিতা-ই বিদ্যমান। সেই কারণে হিন্দুদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা তাঁহারা অনেক সময়ে করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকে তাঁহারা অপদার্থ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন নাই। কবিবর রাম শর্ম্মা “ভাগবতী গীতা” ও “রাজকুমারী লীলার স্বয়ম্বর” নামে ইংরাজী কবিতা দুইটীতে রূপকের অন্তরালে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত যোগতত্ত্ববিশেষের গূঢ় রহস্য দার্শনিকের ন্যায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য-ভাবাবিষ্ট সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই যে, কবি পদ্যময় ইংরাজী ভাষার মারফৎ উক্ত যোগতত্ত্ব শুনাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই নিষ্ঠাবান হিন্দুর কবিহৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোনও কিছু ছিল না। তাঁহার সমকালে যে সকল হিন্দু কবি পদ্যময় ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ন্যায় ও সত্যের দিক হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিচার করিয়া গিয়াছেন। বিবেকের বাণীকে দাবিয়া রাখিয়া তাঁহারা অন্ধের ন্যায় যুক্তিহীন কর্ম্মকাণ্ডের পিছনে ছুটিয়া চলেন নাই। ইংরাজী শিক্ষার ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের বিচারশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও বেদ-পুরাণাদি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবার সুবিধা হওয়াতে খাঁটি হিন্দু কবিরা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াও যেমন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন নাই, তেমনি আবার তাঁহাদের সমসাময়িক হিন্দুসমাজে যে সকল কু-সংস্কার কদাচার অন্যায় ও অবিচার প্রবেশ করিয়া সমাজকে কলুষিত করিয়াছিল সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাদিগকে বদ্ধপরিকর করিয়াছিল। হিন্দু-ভারতের পরাধীনতার প্রধান কারণ যে হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মমতের অনৈক্য, ইহা ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী কবিরা উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। রূপ-কের আবরণ, কবি-কল্পনার যাদুকরী সৃষ্টি-ক্ষমতা, মানব-শাসিত সমাজের বিধিব্যবস্থার অন্তরালে স্বার্থপরতার অস্তিত্ব কিরূপে স্বাধীন আর্য্যজাতিকে উপশাস্ত্রের নিষ্পেষণে নির্জীব করিয়া শেষে অনৈক্যের পিশাচশক্তির প্রভাবে বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। জাতীয় দুরবস্থার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক হিন্দু-কবি সেইজন্য ইংরাজী কবিতার ভিতর দিয়া এদেশের দেবতাবহুল ধর্ম্মজগতে একেশ্বরবাদিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকদিগের নিকট আমরা কেন যে এদেশের কবি ও কাব্যের সুসম্পূর্ণ সমালোচনা আশা করি না তাহার কারণ, তাঁহারা হিন্দু-কবির জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের সংবাদ রাখেন না, কবি ও তাঁহার বংশের ইতিহাস পাঠ করেন না, পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করেন মাত্র ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কবির আদর্শ বুঝিবার জন্য যতটা সহৃদয়তা ও কল্পনা দরকার তাহা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। মিল্টন, শেলি, কীটস্, টেনিসনপ্রমুখ কবিরা বাল্যাবধি রোমান ও গ্রীক-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া যদি বৃটিশ কবির বৈশিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে মধুসূদন, শশীচন্দ্র, রাম শর্ম্মা, রবীন্দ্রনাথ, তরু দত্ত প্রভৃতি ইংরাজি ও বঙ্গভাষার কবিরা পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া কেন যে

বাঙ্গালী কবির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, ইহা ত আমরা বুঝি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুকবিরা সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় খৃষ্টান কবিদের সংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। খৃষ্টান কবি মধুসূদন বিপ্লবময় সমসাময়িক হিন্দু-জগতের চিত্র 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের পটে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বিলাসপরায়ণ ধর্ম্মহীন বাঙ্গালী রাক্ষসগণ কিরূপে ঐশ্বর্য্যহীন ধর্ম্মভীরু ত্যাগী প্রাচীনপন্থীর নৈতিক বলের সম্মুখে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মধুসূদন 'মেঘনাদবধ'-কাব্যে দেখাইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়পরতা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে সীতাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রাচীন আর্য্যসমাজের ভেদজ্ঞানশূন্য অত্যুন্নত আদর্শে সাম্য ও মৈত্রীর অধিকারের মধ্যে বানররূপী অস্পৃশ্যকে টানিয়া লইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ'-কাব্যের নাটকীয় ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম ও সমাজনীতির আলোচনা করিয়া অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতিকে যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনি বাল্মীকির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য ঘৃণিত বানররূপী অনার্য্যের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া কিরূপে রাক্ষসের অত্যাচার হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল, বাল্মীকির রামায়ণে তাহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মধুসূদন দত্তের অমিত শক্তিশালী প্রতিভা সপ্তকাণ্ড রামায়ণের যুগব্যাপী ঘটনার ভিতর হইতে লঙ্কাকাণ্ডের একটিমাত্র অধ্যায় বাছিয়া লইয়া অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-কৌশলে তাহাকে স্বাধীনতাবাদের মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। "মেঘনাদবধ" কাব্যে বর্ণিত ট্রাজিক্ ঘটনাবলীর সূত্রপাত যেখানে, তৎপ্রতি আর একজন খৃষ্টান কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সমাজ যে কারণে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহারও সন্ধান পাইয়াছিল। বাস্তবিক তরুদত্ত "হিন্দুস্থানের গাথা ও কাহিনী"তে (Ballads and Legends of Hindusthan) "লক্ষ্মণ" শীর্ষক ইংরাজী কবিতায় সীতাহরণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারও মূল আদর্শ রামায়ণ হইতে গৃহীত। স্বাধীনতা সমাজের অবস্থাবিশেষ। ইহার চরম লক্ষ্য সমাজ যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না পড়ে। স্বাধীন জাতিরা জাতিদেবতার প্রতিভূস্বরূপ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আদেশ সেইজন্য প্রাণপণে পালন করে। জাতি বা সমাজের মধ্যে যদি অধিকাংশ লোকে স্ব-স্বপ্রধান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অনৈক্যের উৎপত্তি হয়, সমাজ বা জাতি তাহাতে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, শেষে শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে না। সীতা আর্য্যসমাজের নেতা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মণকে সতর্ক রক্ষকের কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিলে তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে স্বাধীনতা হারাইয়া তিনি রাক্ষসের গৃহে বন্দিনী হইয়াছিলেন। এস্থলে বক্তব্য যে, বাল্মীকি মধুসূদন বা তরুদত্ত কোন তত্ত্ববিশেষ আলোচনা করিবার জন্য রামায়ণে বিবৃত ঘটনাবিশেষ পদ্যময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। নিপুণ শিল্পী কাব্যের আসরে বীর ও করুণ রসকে উপদেষ্টার পদ্যময় যুক্তির ভাণ্ডে ফেলিয়া তত্ত্ববিশেষের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। সমাজতত্ত্ব কাব্যরসের উপাদান না হইলেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের উপর যে কাব্য গঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে একটুখানি সমাজতত্ত্বের যে ইঙ্গিত আছে তাহা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। পারিপার্শ্বিক বাঙ্গালী সমাজের প্রভাব যে "মেঘনাদবধ" কাব্যে অনুভূত হয়, একথা সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। মধুসূদন ও তরুদত্তের সমকালে বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, যদি কেবল সেই দিক দিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি তাহা হইলেও এই দুইজন খৃষ্টান কবি কেন যে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ব্যাপারটাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া আলোচ্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত অতুলনীয় সীতাচরিত্র কাব্যের আসরে স্বাধীনতাবাদকে পরিস্ফুট করিবার পক্ষে যে সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

লহ প্রভু!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এনেছি চরণে যাহা হে মোর দেবতা!
লহ প্রভু লহ—মরমে দিও না ব্যথা।
ধনরত্ন নাহি মম, তব সিংহাসনে
সাজাইব যাহা দিয়া পরম যতনে।
তরাসে কম্পিত হাতে হৃদয় আমার
এনেছি—দেখিতে ক্ষুদ্র—জীবনের সার।
একমাত্র প্রিয় তুমি—জেনেছ দিয়েছি
সকলি—আমার বলে না কিছু রেখেছি।
লহ প্রভু লহ তুমি। দিওনা নিভিতে
বল বীর্য্য মম। তব ইচ্ছার সহিতে
লহ গো মিলায়ে মম ভাব চিন্তা যত;
তব পদে মম শির কর অবনত।
কঠিন যদি বা কভু দুখের আঘাতে
ফিরে চাহি—দাও যদি ফিরায়ে দয়াতে
হৃদয়, দেছিনু যাহা, দিও গো করিয়া
শুদ্ধ অশুদ্ধে; সুন্দর মাঝে তব হিয়া,
রেখো মোরে। শান্তিসুধা করি' যেন পান
নূতন মুরতি লভি—লভি নব প্রাণ—
আপনে আপনি যেন না পারি চিনিতে—
তোমারি হাতের গড়া পারি গো বুঝিতে॥

ডাক্তার শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবীর শুভ বিবাহ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ২৪শে ফাল্গুন সঙ্গীতভারতী ডাক্তার শ্রীমতী বাণী দেবীর (Mus. Doc. Ind.) সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (M.B.) শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে এই বিবাহে তাঁহার অনুমোদন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই বিবাহে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ বিবাহপদ্ধতিতে বরার্চ্চনা,কন্যাসম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মবিবাহের প্রধান অঙ্গগুলি সুরক্ষিত হওয়ায়, প্রবর্ত্তন অবধি ইহা ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ হিন্দুবিবাহ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে এই পদ্ধতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল তাহার প্রণালী অনেকে অবগত নন। অথচ এই পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনেকের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তাই বর্ত্তমান বিবাহ উপলক্ষে আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ পদ্ধতি যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

বিবাহপদ্ধতি।

ঈশ্বরস্মরণ—সম্প্রদাতা যথাকালে সম্প্রদানশালায় বেদীর সম্মুখে বেদীকে দক্ষিণ বা বামপার্শ্ব করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের স্মরণ করিলেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন। সম্প্রদাতা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'পুণ্যাহ' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং—'পুণ্যাহ'।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'ঋদ্ধি' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ ঋধ্যতাং—'ঋদ্ধি' হউক।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'স্বস্তি' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর সম্প্রদাতা বরকে অর্চ্চনা করিলেন। সম্প্রদাতা অর্ঘ্য লইয়া—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি। অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছি। সম্প্রদাতা পরিচ্ছদ লইয়া—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং। এই পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্লামি। পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেছি। সম্প্রদাতা অঙ্গুরীয় লইয়া—ওঁ ইদম্ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্লামি। অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিতেছি।

অনন্তর সম্প্রদাতা বরকে বরণ করিলেন। ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, কাশ্যপগোত্রং কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরং শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মাণং; শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবল-প্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুম্ এভিরর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র

শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে শুভ বিবাহে দান করিবার জন্য এই অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তোমাকে আমি বররূপে বরণ করিতেছি। জামাতা—ওঁ বৃতোঽস্মি। বৃত হইলাম। সম্প্রদাতা—ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু। যথাবিহিত বিবাহকর্ম্ম কর। জামাতা—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি। যথাজ্ঞান করিতেছি।

অনন্তর স্ত্রী-আচার।

তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার বামহস্তের নিকটস্থ চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্রকে ও দক্ষিণ হস্তের নিকটস্থ তাদৃশ আসনান্তরে কন্যাকে বেদীর অভিমুখী করিয়া উপবেশিত করিলে আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী ব্রহ্মোপাসনা করিলেন।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে।
নমি তোমা। ছেড়োনাকো মোরে।
যতেক দেব হে পিতা
দুরিত মোর করি' দুর,
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে।
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

উদ্বোধন।—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করেন। প্রণাম—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধান—ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। যে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ আমাদের পূজা গ্রহণের নিমিত্ত এখনই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি। ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে; ইঁহার ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যান—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র—ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো, বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

স্বাধ্যায়—এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ওঁ ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি; তোমাকে আমি এই কন্যা দান করিতেছি। জামাতা—ওঁ দদস্ব। দান করুন।

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া—ওঁ তৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়; ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শাণ্ডিল্যগোত্র শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা শ্রীবাণী দেবীকে;

কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্ত-কুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়; কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবল-

প্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা শ্রীবাণী-দেবীকে ;

কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্ত-কুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় ; কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুব-প্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে ; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্র-নাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীম্ এনাং কন্যাং সালঙ্কারাম্ অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা সালঙ্কারা অরোগিণী সুশীলা বস্ত্রাচ্ছাদিতা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে তোমার হস্তে আমি সম্প্রদান করিতেছি। জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা—ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং। ধর্ম্ম অর্থ ও ভোগবিষয়ে তুমি ইহাঁকে অতিক্রম করিবে না। জামাতা—নাতিচরিষ্যামি। অতিক্রম করিব না।

সম্প্রদাতা সুবর্ণ লইয়া—ওঁ তৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে শাণ্ডিল্যগোত্র আমি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুষ্ঠিত এই শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য দক্ষিণাস্বরূপ এই কাঞ্চনখণ্ড কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম বর শ্রীমান শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় তোমাকে সম্প্রদান করিলাম।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি। এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করিতেছি।

ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥ আমার যে এই হৃদয়, তাহা তোমার হউক ; তোমার যে এই হৃদয়, তাহা আমার হউক। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ং॥ দ্যুলোক যেমন ধ্রুব, পৃথিবী যেমন ধ্রুব, এই বিশ্বজগৎ যেমন ধ্রুব, এই সকল পর্ব্বত যেমন ধ্রুব, সেইরূপ এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব হইয়া থাকুন।

অনন্তর বর ও কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অন্যোন্যাবলোকন করাইলেন।

পাণিগ্রহণ—ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন। ওঁ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। আমি সৌভাগ্য নিমিত্ত তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি যে, তুমি যাবজ্জীবন আমার সহিত অবস্থান করিবে। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী এধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক, তুমি পতির হিতকারিণী হও, জীবগণের প্রতি কল্যাণদায়িনী হও, তোমার মন সুন্দর হউক, তুমি তেজস্বিনী হও ; তোমার সন্তান বীর ও দীর্ঘায়ু হউক, তুমি ঈশ্বরপরায়ণা ও সুখভাগিনী এবং মনুষ্য ও পশুগণের কল্যাণকারিণী হও। ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ শ্বশুর-শ্বশ্রূ, ননন্দা ও দেবরগণের নিকট শোভমানা হও। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিহিত হউক ; তোমার চিত্ত আমার চিত্তের সদৃশ হউক ; একমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমার প্রতি তোমাকে নিয়োগ করুন।

তৎপরে বধূ স্বামীগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন—

কাশ্যপগোত্রা শ্রীবাণী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে। কাশ্যপগোত্রা আমি শ্রীবাণী দেবী, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ভর্ত্তা—ও' আয়ুষ্মতী ভব। 'আয়ুষ্মতী হও' এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

রাগিণী সাহানা—ঝাঁপতাল।

তোমারি আহ্বানে আজ পরিয়া মিলন সাজ
এসেছে আশীষতরে শুভ মিলনের পরে।
দীরঘ জীবনপথে ধরি' যেন তব হাতে,
তোমারি করুণা'পরে চলে নিরভর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥
সন্ততি ফেলুক ছেয়ে শত কলতানে গেহ;
তব পুণ্য নাম গেয়ে ধন্য হোক প্রাণদেহ;
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক; ঘুচে যাক দুঃখ-শোক;
আনন্দ হউক নিত্য; অনুচর সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥

আচার্য্যের উপদেশ। তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এতদিন একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি। সাবধান, যেন সংসারের মোহে অভিভূত না হও, ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতিসাধনে ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, সকল গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে—ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমাদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে; তিনি তোমাদিগকে রোগ-শোক, ভয়বিপত্তি ও পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ শচীকুমার! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গলসাধনে যত্নশীল থাকিবে। অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্ত থাকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্মপথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী বাণী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে; অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন, বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতিসাধনে যত্নশীলা থাকিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ যএকোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আশীর্ব্বাদ—অনন্তর দম্পতী ভক্তিতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

খাম্বাজ—তেতালা।

প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
উঠুক ধ্বনিয়া সুরের লহরী—ছুটুক সে ঢেউ প্রাণের উপরি—
সেই ঢেয়েতে বসিয়া সুখেতে প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
যে সুরে আজ জীবনতন্ত্রী বাজাইলে বন্ধু জীবনযন্ত্রী,
সেই সুরে দাও পরাণ ভরিয়া, আনন্দ ছুটুক দুকুল ছাইয়া
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী ॥

সপ্তপদীগমন। দম্পতী দণ্ডায়মান হইলেন, এবং ভর্ত্তা পাঠ করিলেন। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বিপরেতন। এই বধূ কল্যাণবতী; আপনারা সকলে মিলিয়া ইঁহাকে দর্শন করুন এবং ইঁহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া গৃহে গমন করুন।

পরে সম্প্রদান স্থান হইতে বাসগৃহ-গমনের পথে প্রদত্ত সাতখানি আসনে বা সপ্ত মণ্ডলিকায় বধূ ক্রমান্বয়ে পদনিক্ষেপ করিয়া গমন করিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্তপদে সাতটী উপদেশ দিলেন।

ওঁ ঈশে একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত প্রথম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। বললাভের নিমিত্ত দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ ব্রতায় ত্রিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ব্রতের নিমিত্ত তৃতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ ময়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। সুখলাভের নিমিত্ত চতুর্থ পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ পশুভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। পশুলাভের নিমিত্ত পঞ্চম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ রায়স্পোষায় ষট্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ধনলাভের নিমিত্ত ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। সপ্তম পদ নিক্ষেপ করিয়া আমার সহিত সখ্য বন্ধন কর এবং আমার অনুব্রতা হও। অনন্তর সপ্তপদীগতা পত্নীকে ভর্ত্তা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ং সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মায়োষ্ঠ্যাঃ। সপ্তম পদে গমনপূর্ব্বক আমার সখী হও, আমি তোমার সখ্য লাভ করি, অন্য স্ত্রীরা আমার সহিত তোমার সখ্য ছেদন না করুন, সুখকরী স্ত্রীরা আমার সহিত তোমার সখ্য বন্ধন করিয়া দিউন। অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন।

বিবাহসভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলাম।

ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসংজ্ঞা দেবী, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী, ডাক্তার শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীলীলা দেবী, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনীষা দেবী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনা দেবী, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীঅজিতকুমার মল্লিক, শ্রীসরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানদা সুন্দরী দেবী, শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযামিনীপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দময় মুখোপাধ্যায়, শ্রীগার্গী দেবী, শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, ডাক্তার শ্রীরসিকলাল দত্ত, ডাক্তার শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার শ্রীত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবেণীমাধব দাস, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ, শ্রীক্ষীরোদকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, জে. সি. মুখার্জি, এস. এন্. বসু, শ্রীআনন্দ বসু, শ্রীসুজাতা বসু, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত, এন্. সি. সেন, শ্রীসতীনাথ রায়, রায় বাহাদুর শ্রীমৌলীনাথ রায়, শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

উদীচ্য কর্ম্ম।

বিবাহের পর দিবস প্রাতে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ আপনার সম্মুখে ভর্ত্তাকে ও ভর্ত্তার বামপার্শ্বে বধূকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পাঠ করিলেন। যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান-সমান। প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ। ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে। পুরুষ সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত পত্নী নহে। অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ। এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ। স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না, সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে। তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ। যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন। সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ। সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী। সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী। ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু। সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হইবেন। ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী। ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী। কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না। পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্। যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যম্ এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ। সদ্‌বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ। স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন। সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ। দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ। স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃ-কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন। অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ। বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা। যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু-পত্নী-স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র-বধূস্বরূপ, ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

ব্যাখ্যান।—ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। ধর্ম্মসাধনসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে প্রথম উপদেশ ইহা অতীব সারগর্ভ। ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। সাধকের প্রথম সাধন ব্রহ্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় সাধন গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাঁহার নাম নাই, ধাম নাই, রূপ নাই, যিনি সকল সত্যের মূল সত্য, সকল মঙ্গলের মূলাধার, সকল সৌন্দর্য্যের মূল আকর, তাঁহাতে মনের একাগ্রতা হউক, নিষ্ঠা হউক, ভক্তি হউক এবং এই নামরূপময় সংসারের তাবৎ কার্য্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হউক, এই দুইটি সংকল্প যাঁহার মনে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই আপনার হৃদয়ভাস্তরে ধর্ম্মের মূলপত্তন করিয়াছেন, তিনিই সাধক-নামের যোগ্য হইয়াছেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য পরব্রহ্মকে গৃহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা; এই কার্য্য যদি বিধিমতে অনুষ্ঠিত

হয়, তবে পবিত্র প্রেমে গৃহের মুখ উজ্জ্বল হইবেই হইবে, ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে এবং তাহাতে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি বর্ষিত হইলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবেই হইবে, অতএব গৃহের ন্যায় এমন পবিত্র ক্ষেত্রে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ ফলিত না হইবে তবে কোথায় হইবে? এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন। গৃহেতে পরব্রহ্মের পবিত্র প্রেমের ছায়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়; "এক ভানু অযুত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রেম হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী-হৃদয়ে করে বসতি।" গৃহ অতি পবিত্র স্থান, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পতি-পত্নীর প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতা অতি পবিত্র বস্তু, অতএব গৃহেতে পরব্রহ্মকে আনয়ন কর, পবিত্রতা এবং কল্যাণের ক্ষেত্র যে গৃহ, তাহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল বীজ বপন কর, তাহা হইলে যথাকালে প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, আমাদের মনের চাঞ্চল্য বশত প্রথমে আমরা তৎপ্রতি বুদ্ধিকে স্থির করিতে পারি না। প্রীতির সহিত এবং ভক্তির সহিত পরব্রহ্মকে ভজনা করিলে মন প্রশান্ত হয়, এবং বুদ্ধি স্থির হয়, এবং সেই একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধিতে পরব্রহ্ম ধ্রুব তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কার্য্য কিরূপ, ইহা সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে,—তিনি যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। সাংসারিক ব্যক্তিরা যে কোন সৎকর্ম্ম করেন তাহাতে আপনাকেই প্রতিবিম্বিত দেখিতে চান এবং আপনার নামকে প্রতিধ্বনিত শুনিতে চান, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আপনার কৃত কার্য্যে আপনার প্রিয়তম পরমাত্মাকেই দেখিতে পান এবং তাঁহার নামকেই শুনিতে পান, কেন না আপনা অপেক্ষা তিনি পরমাত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। পরব্রহ্মতে যখন আমরা আমাদের সকল কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিব তখনই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত পথে দণ্ডায়মান হইব। হে পরমাত্মন্! যাহাতে তোমার সেই অমৃতময় পথ অবলম্বন করিতে পারি তুমি আমাদের আত্মাতে সেইরূপ বলবীর্য্য প্রদান কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর বধূকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন। বৎসে বাণীদেবী! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কর।

সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা হইতেছে—সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতেছে—পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিব না। ব্রহ্মোপাসকের এই প্রতিজ্ঞাটী দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত; সৃষ্ট বস্তুমাত্রই অন্তত স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবেই। সুতরাং আমাদের ক্রমোন্নতিশীল আত্মার শ্রদ্ধাভক্তি পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ নহেন। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে তাঁহার নিকট যাও, সকল বাধাই অতিক্রম করিবে। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে প্রজ্জ্বলিত রাখেন, আমাদেরও অন্তরে বিশ্বপিতা অখিল মাতা ঈশ্বরের উপাসনাকে সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে ক্ষান্ত হইও না। সেই অন্তর্যামী পরম পুরুষ শূন্য নিরাকার নহেন। আমাদের আত্মা যেমন নিরাকার—ইচ্ছা শক্তি জ্ঞান ও প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পুরুষ, অনন্তমঙ্গল ভগবানও সেইরূপ অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পরম পুরুষ। নিরাকার বলিয়াই যেমন আমাদের আত্মা আমাদের দেহ ও মনের সকল অংশ একই সময়ে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তেমনি সেই পূর্ণ পুরুষ নিরাকার বলিয়াই কি বহির্জগতের কি অন্তর্জগতের প্রত্যেক অংশ নিজের পূর্ণস্বরূপে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এইরূপে নিজের অরূপ রূপে তাঁহার ব্রহ্মচক্রের প্রত্যেক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজা করা সম্ভব। এই কারণেই উপাসকের সহিত উপাস্য ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগ।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মসমাধান করিব। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে জানিবার অধিকার রাখি, কিন্তু জড়পদার্থেরও যেমন স্বরূপ জানি না, আত্মারও সেইরূপ স্বরূপ জানি না। দর্শন, মনের নিয়মন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা আত্মার পরিচয় পাই। সেই আত্মা মহান আত্মা পরমাত্মাতে অধিশ্রিত। সুখসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকিলে অনেক সময়ে এই সত্য স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখবিপদের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া একটা আশ্রয় পাইবার জন্য যখন ব্যাকুল হই, তখনই বুঝিতে পারি একটি আত্মাও নিরাশ্রয় নহে, প্রত্যেক আত্মাই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বজগতেরও আত্মা সেই পরমাত্মা; তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

আত্মা যেমন আমাদের শরীর ও মনের আশ্রয়, পরমাত্মাও সেইরূপ আত্মার একমাত্র আশ্রয়, আত্মার প্রাণ। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। আত্মাকে না জানিলে সকলই শূন্য। আত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মাকে পাইবে না। আত্মা সুস্থ থাকিলেই আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে জানা সহজ হয়। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মারও স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করা আবশ্যক। যেমন মাটির নীচে যথেষ্ট জল থাকিলেও গাছে নিয়মিত জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়, সেইরূপ ভগবান আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন করিয়া আত্মাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হয়। এইরূপ যোগসাধনই হইল আত্মার অন্ন। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যোগযুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি এবং তাহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ত।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী; সঙ্গে সঙ্গে আত্মা মধুময় হয়। বিশ্বজগৎ সেই আত্মার নিকটে মধুময় হয়। যোগযুক্ত আত্মা শান্তিসমুদ্রে অটল থাকে। জগতের অনেক বিষয়ের কারণ ও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও, জীবনের অনেক রহস্য ভেদ করিতে না পারিলেও মঙ্গলস্বরূপের উপর তাঁহার বিশ্বাস কিছুমাত্র টলে না। ঈশ্বরকে যিনি আত্মস্থ দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়; মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না; বিপদ তাঁহার নিকটে সম্পদ হয়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী এবং ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় পিতামাতা, অন্তরতম সখা সুহৃৎ। এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

এই আত্মসমাধানের জন্য যেমন ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন ব্যতীত অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ স্থান বা কালের বিষয়েও নির্দ্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই। যে স্থানে এবং যে সময়ে যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আসিবে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই অবস্থাতেই পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবে।

আত্মসমাধানের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনেরও একান্ত প্রয়োজন নাই। ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্রের অর্থধ্যান বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি হইবে এবং পরমাত্মাতে আত্মসমাধান সহজসাধ্য হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান অভ্যস্ত হইলে আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারি; বিপদের সময় তাঁহাকে বিপদের কাণ্ডারী এবং সুখে দুঃখে তাঁহাকে সখা ও সুহৃৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। পাপে পতিত হইলে তিনি পতিতপাবন; মুক্তির জন্য শরণাপন্ন হইলে তিনি মুক্তিদাতা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা হইতেছে—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব; পঞ্চম প্রতিজ্ঞা—পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। আত্মসমাধানের ফলে ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও সহজ হয়। তখন অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার বলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয় এবং পাপকর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়। আমরা প্রত্যক্ষও করি যে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি এবং পাপকর্ম্মের ফল সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মুখে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন এবং কার্য্যে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যসাধন—ইহাতে গুরুতর অধর্ম্ম হয়।

পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইলেও সীমাবদ্ধ মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু অনন্ত মঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক থাকিতে পারে না। ইহা জানা কথা যে, সংসারে নানা বিষয়ে নানা

ভুলভ্রান্তি করিয়া অনেক অমূল্য সময়ও নষ্ট করি এবং অনর্থও আনি। কিন্তু তজ্জন্য বৃথা হাহুতাশ করিবার পরিবর্ত্তে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে অটল আস্থা রাখিয়া, তাঁহার হস্তে ফলাফলের ভার নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামহৃদয়ে শুভ কর্ম্ম করিতে থাক, ভগবৎবিধানেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পদ্মপত্র হইতে জলের মত ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে। মোহবশত কখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেও তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইলে, পাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হৃদয়ের অনুতাপের রক্তে পরমেশ্বরের চরণ ধৌত করিলে তিনি সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া আদরপূর্ব্বক তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। তাই ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞায় পাপ করিলে তাহা হইতে অনুশোচনা পূর্ব্বক বিরত হইবার কথা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব। যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মোক্ষপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সম্মুখে যে উচ্চতম আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, সেই আদর্শকে গৃহে গৃহে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা চাই-ই। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করা। তাই প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেকের পক্ষে এই দান যতদূর সম্ভব সহজ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে যে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ষে বর্ষে যথাশক্তি দান করিলেও সে ঋণদায় হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঈশ্বর ও সংসারের বিরোধ উপস্থিত হইলে সহস্র বাধা সত্ত্বেও সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে। এই সকল উপায়ে যে বিদ্বান ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বরকে জীবনের সাক্ষী জানিয়া নির্ভয় হও—রোগ-শোক ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর—তাঁহাকে অন্তর্য্যামী পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখা-সুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতা মাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া অনুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের বর্ম্মদুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠতম যোগ—তিলমাত্র ব্যবধান নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। তাঁহাকে নিকটতম অন্তরতম প্রাণের প্রাণরূপে প্রত্যক্ষ কর এবং জীবনকে সার্থক কর।

সৌম্য শ্রীমান শচীকুমার! যাহাতে তোমার পত্নী এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত পালনে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান-ধর্ম্ম, সুখ-শান্তি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে। কায়মনোবাক্যে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবে! 'ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যোমা নোধর্ম্মোহতোহবধীৎ।' যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' বলিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ওঁ য একোহবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; এই ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপ্ত।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(প্রাতঃকাল)

গান্ধারী—আড়াঠেকা।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া।
তোমারি মধুরে সকলি মধুর—
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া।

আশাবরী—আড়াঠেকা।

প্রাণ মোর ধাইছে
তোমার পদে প্রভু হে
দূর কর জননী ত্রাস আমার
ভবে ভয়সঙ্কুল॥

রামপ্রসাদী।

(মন) প্রাণ খুলে গাও, মায়েরি নাম॥ (ধুয়া)
বিপদ্ আপদ্, যাই না আসুক,
বিকট্ হাসি যতই হাসুক্,
(ওরে) বাঁকিস্ নে টুক্, এদিক্ ওদিক্,
মায়ের্ পরে রাখিস্ রে প্রাণ।
(যবে) ধনরাশি, রাশি সুখ,
ভরে দেয় তোর হাসিতে মুখ,
(তখন) ভুলিস নেকো, সার কথাটি,
সকলি এ মায়েরি দান।
উঠিস যবে সকাল হোলে,
ফিরিস যবে সাঁঝের কোলে,
(তখন) ভক্তিভরে চরণ পরে,
মাথা থুয়ে করিস প্রণাম॥

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণ মন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্যামী
তোমা নাথ যেই চাহে তাহে দাও অচল শরণ।
তব প্রথম তেজ দেব অসংখ্য ভুবন সৃজিল;
সকল পাপ অজ্ঞান দূরিল প্রীতি তব দেব সুঘন।
গাহিছে গুণ অশেষ সুর মানব, দেবেশ তব
অন্ত কেহ নাহি পায়।
চিত্তে দাও ভক্তি অচল, দাও হে কৃপা আনন্দ—
যাচি আর নাহি কিছু; তুমি মোর হে দারিদ্র্যহরণ।

দরবারী টোড়ী—চৌতাল।

শঙ্কানাশিনী জননী মহা দুঃখহানি-বারণ হে প্রেমসাগর।
যাচি অপার দয়া বিতরি' প্রেমরূপ
ভক্তচিতে ভয়হারী হে পুরুষোত্তম কর অশুভ দূর।
হৃদয়-উৎস প্রাণবন্ধু প্রাণেশ্বর পুণ্যনাম
পিতা তুমি স্নেহে অতুল।
জগন্নাথ সুখশান্তি ঝরে তব নাম গানে;
উপজে দরশে পরশে তব
হৃৎবৃন্দাবনে শুভামল।

ভৈরবী—তেতালা।

দেখা দাও—দাও সখা হৃদয়ে—মোর হৃদয়ে।
থেকোনা দূরে মোরে—ধরি তব চরণে;
ডাকিছে সুদীনে করজোড়ে—দেখা দাও প্রাণবিহারি—
প্রভু বাঁচাও ভকতে॥

মহাত্মা গান্ধীর অভিযান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঘটনাটী ভারতের ইতিহাসে এতই বড় যে, ইহা রাজনীতিসংশ্লিষ্ট হইলেও আমরা ইহার উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। গত ২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ্চ) ভারতের ইতিহাসে একটী অনন্যসাধারণ স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ৭৯ অনুচর সহ সবরমতী আশ্রম হইতে দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জালালপুরে লবণকর সম্বন্ধীয় নিষেধবিধি অহিংস-প্রণালীতে অমান্য করিবার জন্য পদব্রজে যাত্রা করিয়াছেন। বহুকাল অবধি লবণ প্রস্তুত করিয়া নিষেধবিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ন্যূনাধিক বলে মধ্যে মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। লবণ ব্যতীত কি মনুষ্য, কি জীবজন্তু জীবন ধারণ করিতে অন্ততঃ নীরোগ থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, যখনই কোন কারণে লবণের দাম বাড়িয়া যাইত, তখনই লবণকরের বিরুদ্ধে নানাবিধ আন্দোলন চলিত। লবণের দাম বৃদ্ধি হইলে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলকে, বিশেষত দরিদ্রদিগকেই বিশেষভাবে আঘাত করে ও পীড়া দেয়, কারণ লবণ ব্যতীত দরিদ্রদিগের শাকভাত খাইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব হয় না। যে বিষয় ধরিয়া অভিযান করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিবাসী মাত্রেরই সহানুভূতি পাইতে পারেন, এমন একটী বিষয় মহাত্মা গান্ধী কিছু কাল ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন। সে দিক দিয়া

দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, বিষয়টী ঠিকই ধরা হইয়াছে, কারণ ইহা ব্যতীত এমন কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, যাহার জন্য সমগ্র দেশের সহানুভূতি সহজে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। এই লবণসমরের রাজনৈতিক ফলাফল যাহাই কেন হৌক না, ইহার নৈতিক ফল বড় অল্প নহে। ঐ যে একটী ভাব—ধীর বিবেচনার পর যাহা অত্যাচার বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, মৃত্যুকেও বরণ করিয়া অহিংস প্রণালীতে বাধা দিবার ব্যবস্থা করা, ইহার মূল্য যে কত অধিক, ইহা সমগ্র দেশবাসীকে নৈতিক উন্নতির সংযমের কত উচ্চ শিখরে লইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক এই মুহূর্ত্তে কিছু কিছু বুঝিলেও সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিতেছি বলিয়া বোধ হয় না—কিছুকাল পরে যে নিশ্চয়ই বুঝিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। একটা বড়ই সুখের বিষয় যে, মহাত্মা গান্ধী যে কোন বিষয়ে হাত দিতেছেন, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, ভগবানকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া হাত দেন না; প্রত্যুত, ভগবানের উপর এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্য ও ধর্ম্মের উপর সবল আস্থা রাখিয়া তিনি সকল সমস্যারই নিরাকরণে উদ্যত হন। যেভাবে বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে এই বাণী উঠিয়াছিল—"ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং", ঠিক সেই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া গান্ধীজি অহিংসাসিদ্ধ হইয়া হিংসামূলক রাজনীতিকে পরাজয়প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঐ মহাবাণী ভারতবাসীর হৃদয়ে কথা ও কাহিনীর আকারে ধ্বনিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু ভারতেরই অধিবাসী মহাত্মা গান্ধী এই নব যুগে নিজের অনুপম সাধনার বলে সেই মহাবাণীকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। মহাত্মার এই অভিযান লইয়া বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথেষ্ট মাথা ঘামাইতেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় কুটিল রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কোনপ্রকার উপদেশ দিবার জন্য অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—সে উপদেশ উপেক্ষিত হওয়াই সম্ভব। তথাপি দেশের এই দুর্দ্দিনে, যাঁহার সুবুদ্ধিতে যে উপদেশ উদিত হয়, তাহা অন্তরে চাপিয়া রাখা কিছুতেই সঙ্গত নহে—প্রকাশ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কাঠবিড়ালও রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়; ইন্দুরও বলবান সিংহের পাশমোচনে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া কথামালায় পড়া যায়। আমাদের মনে হয় যে, গবর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ন্যূনতম বাধার পথ (line of least resistance) ধরেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। রঘুবংশে কালিদাস একস্থানে লিখিয়াছেন মনে পড়ে যে, বেত নত হইয়া যায় বলিয়াই প্রবল স্রোতেও উৎপাটিত হয় না। লবণকর উঠাইবার জন্য সমগ্র দেশবাসী যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে উদ্যত, তখন গবর্ণমেণ্টের দেশবাসীকে বলা উচিত যে, "ভাল, লবণ-কর উঠাইয়া দিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে যে আয় হইত, সেই আয় অন্য কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া দাও।" ইহা বলিলে দেশবাসীর বর্ত্তমানে কিছুই বলিবার থাকিবে না। সংবাদপত্রে দেখি যে, মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের পথে পাঠানবাহিনী রাখিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করা হইবে। জানি না, ইহা সত্য কিনা, সত্য হইলে ইহা কোন সুবুদ্ধি সমরনীতিজ্ঞের মস্তিষ্কপ্রসূত হইতে পারে না। যিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা বলিব যে, তাঁহার বুদ্ধি বড়ই অল্প। মহাত্মার অহিংসানীতির আঘাত সকল জড়াত্মক বাধা দলিত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের পর অবধি দেশবাসীর আত্মার বলকে নানা উপায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। আমাদের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মদৃষ্টিতে বিচার করিয়া যে প্রণালীতে শাসনব্যবস্থা করা আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট সেই প্রণালী অবলম্বন করুন, দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব স্থায়ীভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা করুন, শান্তি সহজেই নামিয়া আসিবে; প্রজার সুখে রাজার সুখ, এই অভ্রান্ত সত্যবাণী সার্থক হইবে।

সংবাদ।

স্মৃতিসভা—আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় বিগত ১৬ই মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা এবং তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতানিবেদন জন্য ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজগৃহে ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি অধিবেশন হইয়াছিল। ভবানীপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে সমাজগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। সঙ্গীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক (যাঁহার সহিত শিতিকণ্ঠ বাবুর উলুবেড়িয়া অবস্থান কালীন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল) 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'এর ব্যাখ্যার সহিত পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বেশ ফুটাইয়া তোলেন, পরবর্ত্তী বক্তা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হরকালী সেন, রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। শিতিকণ্ঠ বাবু জীবদ্দশায় যে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, উক্ত সভার লোকাধিক্যই তাহার নিদর্শন। শ্রদ্ধেয় শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয় উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে দুইখানি পত্র চিন্তামণি বাবুকে লিখেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের পত্র—শ্রদ্ধাস্পদেষু—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতিসভায় আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। শারীরিক অসামর্থ্যবশতঃ উক্ত সভায় যোগ দিতে পারিব না, কিন্তু পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতানিবেদন এবং তাঁহার কল্যাণকামনায় অন্তরের সহিত আপনাদের সঙ্গে যোগ দিব। তাঁহার আহ্বানে অনেকবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়াছি ও উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি এবং তদুপলক্ষে তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছি। এখন শরীর দুর্ব্বল ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে বিনা সাহায্যে অধিক দূর যাইতে পারি না, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর। আপনাদিগকে এই পরম বন্ধুবিয়োগে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবুর পত্র—

১১. ৩. ৩০

সবিনয় নিবেদন—

আমার কন্যার বিবাহের কারণে এই বৃদ্ধ বয়সে ছুটাছুটি করিয়া বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, তজ্জন্য আমি শিতিকণ্ঠ বাবুর স্মৃতিসভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। আজ ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইল আমি তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার ২৬ বৎসর বয়সে মহর্ষি যখন আমাকে সমাজের ভার দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র হিসাবে শিতিকণ্ঠ বাবু ও শীতল বাবুর নাম দেখি। সেই অবধি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা বরাবর মনে জাগ্রত ছিল। অবশেষে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁর মত ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ কর্ণধার আমি অল্পই দেখিয়াছি। বেশী কি বলিব—মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে যখন ভবানীপুর সমাজে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তখন পর্য্যন্ত তিনি প্রচুর উৎসাহ সহকারে একটী 'নিবেদন' পাঠাইয়াছিলেন। বড় বড় লোকের বড় বড় কাজের কথা আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু যাঁরা লোকদৃষ্টির অন্তরালে থেকে মহৎ কার্য্যের সহায়তা করেন, তাঁদের বিষয় আমরা ভাববার অবসর পাই না। তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা না করলে বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। আমার মতে এমন একটী ধনভাণ্ডার খোলা উচিত, যার সুদ থেকে এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ—তাঁর প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা যায়। ভগবান আপনাদের মঙ্গল ইচ্ছা ও শুভ উদ্দেশ্যকে সফল করুন। ইতি

অভিনন্দন—গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার রাত্রি ৯ম ঘটিকায় মিষ্টার আলফ্রেড মিরোভিটুষের অভিনন্দন জন্য সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণীদেবীর Mus. Doc. Ind. নেতৃত্বে ১৩৪নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে Y. W. C. A.এর দ্বিতলস্থ প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে গীতবাদ্যের একটী সুন্দর আয়োজন হইয়াছিল। সঙ্গীতনায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতানগরীর বহু খ্যাতনামা গায়ক ও বাদকগণ যোগদান পূর্ব্বক অনুষ্ঠানটীকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রিতেও জনসমাগম আশাতীত অধিক হইয়াছিল। আমরা আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বাণী দেবীর এই কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত।

মহোৎসবে শান্তিবাচন—ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে গত ২৯শে মাঘ বুধবার সায়ংকালে মাঘের শেষ-সন্ধ্যায় 'উৎসবে শান্তিবাচনার্থ' ভারতীয় সকল একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ও প্রার্থনাসমাজে বিশেষ উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐদিন আদিব্রাহ্মসমাজে বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া প্রবীণ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে বেদীর নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীমান হেমেন্দ্র বিজয় সেন এম-এ মহাশয় তাঁহার "মাঘোৎসবের শিক্ষা" বিষয়ে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করেন। উহা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বশেষে আচার্য্য মহাশয় মাঘোৎসবের শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষেপে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

শোকসংবাদ।

৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—রাজসাহীর স্বনামধন্য পুরুষ একাধারে সাহিত্যিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল, সি. আই. ই. মহোদয় গত ২৭শে মাঘ সোমবার প্রত্যূষে তাঁহার রাজসাহীর বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকিয়া অবশেষে আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের দ্বারা প্রভাবিত

তিনি পুত্রের 'অক্ষয়কুমার' নামকরণ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার আবাল্য সাহিত্যিক। ইনি প্রথম জীবনে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও পরে ঐতিহাসিক রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে দেশের অতীত গৌরবের সত্যবার্ত্তা প্রচার করিয়া সাধারণের বিস্ময় ও স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণে সমর্থ হন। অষ্টাদশ যবনের বঙ্গবিজয় ও অন্ধকূপের কলঙ্ক-কাহিনী অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এইরূপ মানসিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিয়া অক্ষয়কুমার আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনে যে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'ফিরিঙ্গি বণিক' 'গৌড়-লেখমালা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইহাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ১৩০২ সাল হইতে সর্ব্বপ্রথম 'সাধনা'য় ও পরে 'ভারতী'তে প্রথমে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে সিরাজদ্দৌলা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা একবার অক্ষয়কুমারের পিতা বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহাদের রাজসাহীর বাসভবনে গমন করিয়াছিলাম। অক্ষয়-কুমার তখন যুবক; তাঁহার সৌহৃদ্যে, সেবায় ও সাহচর্য্যে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। দিঘা-পতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের সহযোগিতায় রাজসাহীতে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" প্রতিষ্ঠা ইহাঁর জীবনের অন্যতর মহনীয় কীর্ত্তি। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন যথার্থ জ্ঞানী ও গুণীকে হারাইয়া সত্যই নিঃস্ব হইল। ইহাঁর শোকার্ত্ত পুত্রপরিজন ও শিষ্য সেবকগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৪০ | ১৮৫১ শক চৈত্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯। চরণস্পর্শ চাই।

তোমাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দেখিতেছি। জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তোমার পরিচয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে দিকে চাই, সেই দিকেই তোমার মঙ্গল হস্ত। সংসারের বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে আমার প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন নির্জ্জনে তোমার চরণে একটুখানি আশ্রয় পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তখন তুমিই আমার মাথার শিয়রে বসিয়া তোমার স্নেহ-হস্ত আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দাও। আমার সমস্ত দেহ-মন জুড়াইয়া যায়; প্রাণের জ্বালা-যন্ত্রণা, অন্তরের আগুন মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়—আর আমি তোমার কোলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়ি। আমার প্রাণের উপর তোমার চরণের স্পর্শ দাও—আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত ভরিয়া স্পর্শ দাও। আমার সকল শোক, সকল কষ্ট তোমার ঐ চরণস্পর্শে বিদূরিত হোক। শৈশবে তোমারই স্তন্যে লালিতপালিত হইয়া যে প্রকার দেহে বলিষ্ঠ ও মনে দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়াছিলাম, জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের কালে আর একবার আমার দেহে সেইপ্রকার বল ও মনে সেইপ্রকার তেজ ঢালিয়া দাও। আর একবার তোমার নামে জয়ধ্বনি করিয়া বহির্জ্জগতে বাহির হইবার শক্তি-সামর্থ্য দাও।

১০। ধ্রুবতারা।

জননী! তুমি তো জান, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। ক্ষণেকের জন্যও তোমাকে না দেখিলে জীবনটা দুর্ব্বিষহ মনে হয়। তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ। আমার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া তুমিই অবস্থিতি কর। তোমার এতটুকু বিরহও আমার অসহ্য। আমার জীবনে সঙ্গীত যাহা কিছু ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, সে সমস্তই তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া ধ্বনিত হয়। তোমাকে ছাড়িয়া আমার জীবনে অন্য কোনও সঙ্গীতই উঠিতে চাহে না। কত স্থানে কত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—একমাত্র আশা, প্রাণের মধ্যে তোমাকে লাভ করিব। এখন দেখিতেছি, একমাত্র অন্তরের নিভৃত নির্জ্জন কুটীরেই তুমি নিত্য জাগিয়া আছ। তাই সেই কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার চরণখানি বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত জ্বালা সকল যন্ত্রণা জুড়াইতে চাহি। সংসারের ছোটখাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি মাতামাতি করা আর ভাল লাগে না—আমার সহ্য হয় না। সংসারের একএকটী বিষয় কানে আসে, আর আমার মনপ্রাণ বজ্রাহতের ন্যায় কাঁপিয়া উঠে। না—মা—আমাকে আর দূরে সরাইয়া রাখিও না—তোমার চরণতলে একটুখানি বসিবার স্থান দিও।

১১। সংসার-শ্মশানে।

জননী আমার! একটীবার আমায় দেখা দাও। এ কোন্ মরুভূমির মাঝে আসিয়া পড়িয়াছি! কে আমাকে এ কোন্ শ্মশানের মাঝে আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল! যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই মৃত্যু!

কোথায় কে মরিয়া পড়িয়া রহিল, যে সমস্ত পথিক এদিক দিয়া যাইতেছে, তাহাদের কেহই সেদিকে কোনও লক্ষ্যই করে না। পথের ধারে বসিয়া যে মরিতেছে, কেবল তাহারই মাথা কোলে লইয়া তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া—সমস্ত শোক যেন নিংড়াইয়া তাহার মুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এই আছে—এই নাই; এমন সংসারে কে তুমি আমাকে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছ? আমি কি ভূষুণ্ডি কাকের মত এই শ্মশানে বসিয়া দিন নাই রাত নাই এই মৃত্যুরই খেলা দেখিব আর হাহাকার শুনিব? জননী! এই শ্মশানে মৃত্যুর খেলা দেখিতে আমার আর ভাল লাগে না। জরা নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, এমন যদি কোন স্থান থাকে, তবে সেই স্থানেই আমাকে লইয়া যাও। যে মরিল, কৈ—সংসারের টাকাকড়ি ঘরবাড়ী এসমস্তের কোন কিছুই তো সঙ্গে গেল না? তবে এসমস্ত লইয়া দুদিনের জন্য বৃথা খেলা খেলিয়াই বা কি করিব? যে ভবের খেলা খেলিতে চায়, সে খেলুক। তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে ছেলেরাও তো কাঁদে; তেমনি এসমস্ত লইয়া যাহারা খেলা করিবে, দুদিন বাদে তাহাদিগকেও সেই রকম কাঁদিতে হইবে। আমি যথেষ্ট খেলা করিয়াছি, যথেষ্ট কাঁদিয়াওছি। আর না—এখন তোমার চরণতলে বসিয়া, তোমার কোলে মুখ রাখিয়া মাথা রাখিয়া নিত্য শান্তি পাইতে চাহি। তুমি আমার মাথায় হাতটী রাখ, আর আমি তোমার চরণখানি বক্ষে জড়াইয়া ধরি।

১২। দর্প চূর্ণ।

জননী! শুনিতে পাই, আমি নাকি দেখিতে বড় সুন্দর ছিলাম। একথা আমাকে এখন কেহ বলিলে মনে হয় আমাকে উপহাস করিতেছে। মনে হয়—হয়তো বা আমি সুন্দরই ছিলাম। তুমি যে পরম সুন্দর—তোমার সৌন্দর্য্যের যে তুলনা নাই। তোমার সন্তান যখন আমি, তখন আমি সুন্দর না হইবই বা কেন? কিন্তু আমার তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না—আমার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল, সে সমস্তই তো তোমারই দান। তবু মনে হয়, আমার অজ্ঞানত আমার মনে গর্ব্ব আসিয়াছিল। এখন বুঝিতেছি—আমার এই সুন্দর দেহ—ইহা তো একখানি তাসের ঘর মাত্র। কখন্ কোথা হইতে মরণবায়ুর একটা ফুৎকার লাগিবে, আর সেই তাসের ঘরখানি পড়িয়া গিয়া চুরমার হইবে। এখানকার যাহা কিছু, এসমস্তই তো মরীচিকা—মায়ার খেলা; আসিয়াছি, কাজ করিতেই হইবে—না করিয়া উপায় নাই, এইটুকু বুঝিয়াছি। কিন্তু তাহার পর? কোথায় যাব, তাহারই স্থিরতা কোথায়? তবু—এখানে তোমার কথা শুনিলেই প্রাণে এত আনন্দ হয় কেন? তখন মনে হয়—মায়া-মরীচিকার কুয়াসা বুঝি কাটিয়া গেল,—আর, সত্যের বিমল আলোক প্রাণের ভিতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মা! আমার দম্ভ অভিমান সমস্তই চূর্ণ করিয়া দাও; তোমার চরণে আমার মাথা নত করিয়া দাও। এখন আমার সে সৌন্দর্য্যও নাই, সে শক্তিও নাই। এখন তোমার করুণাধারায় আমার অন্তরকে তুমি ধুইয়া দাও। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলুক। আমি তোমার মুখের বাণী প্রতীক্ষা করিতেছি—তোমার চক্ষে আমি সুন্দর হইয়াছি কি না।

১০। জীর্ণতরী।

আমাকে তুমি কি দিয়াছিলে, আর জীবনের এই সন্ধ্যা-কালে তোমার চরণে আমি কি আনিয়াছিলাম! আমার অন্তর ভেদ করিয়া কেবলই তপ্ত অশ্রুর অজস্র ধারা অবিরল ধারে ঝরিতেছে! তোমার চরণতলে বসিবার আমি উপযুক্ত নহি। আমাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দাও। অনুতাপের অশ্রুবারিতে আমার সকল পাপ, সকল অপরাধ ঝরিয়া যাইতে দাও। তোমার নিকট যাতায়াতের জন্য কি সুন্দর দেহতরীই না দিয়াছিলে, আর তাহাতে মনের কি সুন্দর পালই না লাগাইয়া দিয়াছিলে। কিন্তু আজ তোমার চরণে সেই তরীখানি শতচ্ছিদ্র করিয়া আনিয়াছি—চারিদিক হইতে তাহার ভিতর কেবল লবণাক্ত জল উঠিতেছে। পালখানিও ছিন্ন চীরখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে এই হারা ছেলের সন্ধানে তোমার কাতর আহ্বান শুনিয়া কোনক্রমে এই জীর্ণ তরীখানি লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। সমস্ত পথ ভয়ে ত্রাসে লজ্জায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। তোমার শত-সহস্র ছেলে-মেয়ে আজ তোমার ঘরে আসিয়া কত-না আনন্দে বিচরণ করিতেছে। আমার আনন্দ আমি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি। আবার যদি তুমি প্রফুল্ল মুখে তোমার মঙ্গল-চরণ আমায় বক্ষে ধারণ করিতে দাও, তখন আমি আবার আশায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইব।

১৪। শেষ দিনে।

জীবনের কাজ যখন সারা হবে, এলোকের সঙ্গে যখন আমার কোনও সম্বন্ধই থাকিবে না, তখন তোমার ঐ পবিত্র চরণধূলি আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিও। ঐ চরণধুলিই আমার ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরী হইবে। আমার সকল গর্ব্ব এখন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। সকল দর্প এখন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন পলকে পলকে দেখিতেছি, মৃত্যুর নিকট এসকল গর্ব্ব দর্প অভিমান কিছুই দাঁড়ায় না—

এত কিছু, মৃত্যু নিমিষে সকলই হরণ করে। এখন মনে করিলে হাসি পায়, লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হই যে, এক সময়ে আমি নিজেকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ মনে করিতাম! সেই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়া নিজের যাহা ক্ষতি করিবার তাহা তো করিয়াছি। কিন্তু সব চেয়ে ব্যথা পাই ভাবিয়া—মনের দুঃখে পাথরের আঘাতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়—যে, আমার অন্যায় আচরণে তোমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। আমি এখন সংসারের পারে দাঁড়াইয়া আমার কৃত কর্ম্ম স্মরণ করিতেছি, আর অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি! জননী! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার মহাপ্রস্থানে আত্মীয়স্বজনেরা শোকপ্রকাশ করুন বা নাই করুন, আমার তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু তোমার চরণধূলি না পাইলে, আমি ইহলোকেই থাকি বা পরলোকেই প্রস্থান করি—সঙ্গে সঙ্গেই তো আমার মৃত্যু। সেই মৃত্যু, সেই বিনাশ হইতে তোমার চরণধূলি আমাকে রক্ষা করুক।

১৫। শেষ মুহূর্ত্তে।

জননী! আমার সময় তো শেষ হইয়া আসিয়াছে—মহাপ্রস্থানের সময় তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার বীণায় যে গান আপনাপনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, তাহার সুর ইহলোকের সুর নহে—উহা পরলোকের সুর। তোমার সুদূর স্বর্ণপুর হইতে সেই সুরের অস্ফুটধ্বনি মৃদুমধুর সুরে নামিয়া আসিতেছে। সেই গানের অস্ফুটধ্বনি শুনিয়া তোমার সেই স্বর্ণপুরে যাইবার জন্য আমার প্রাণ তো পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমার সুখ-দুঃখ শোক-তাপ সকলই তো ভুলিয়াছি। আমার এখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান—আমি কেমন করিয়া তোমার ঐ স্বর্ণপুরে যাইতে পারি। তোমার লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া শতবিধ বর্ণে রঞ্জিত কত সুন্দর নৌকায় চড়িয়া সারিবন্দী চলিয়াছে—মনে হইতেছে, আনন্দের হাসিগুলি লক্ষ লক্ষ বেলফুলের আকারে তোমার চরণে নিবেদিত হইতে চলিয়াছে। আমার হৃদয়খানি উঁহাদেরই পশ্চাতে চলিয়া কোন প্রকারে তোমার চরণে পৌঁছিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে—আমার প্রাণখানি ছুরিকা দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া অথবা পাষাণের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া সেই অবস্থাতেই তোমার চরণে নিবেদন করিয়া আসি—যদি তাহা দেখিয়াও তোমার একটুখানি দয়া হয় আর স্নেহহস্তে তাহা তুলিয়া লও। আমি এতদিন কি করিয়া যে তোমা হইতে দূরে ছিলাম, তাহা জানি না। এখন দেখিতেছি, আমাদের উভয়ের মাঝে কি এক মহাসাগরের ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। সেই মহাসাগরের এপারে আমার আঁধার কুটিরখানিতে আমি বসিয়া আছি। তোমার নিকটে যাইবার জন্য আমার প্রাণ পাগল, কিন্তু আমার জীর্ণ তরী লইয়া যাইতে সাহস করিতেছি না। সকলের পশ্চাতে একমাত্র আমিই পড়িয়া আছি। অপেক্ষা করিয়া আছি—কবে তুমি আমাকে এই মহাসাগর পার করিয়া দিবে।

১৬। কোলে লও।

মা আমার! তোমার কোলে উঠিবার জন্য আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তোমার অন্য ছেলে-মেয়েরা তোমার কোলে উঠিবার জন্য বিশেষ কিছু লালসা দেখাইতেছে না, অথচ তাহাদিগকে তুমি কোলে তুলিয়া কত না আদর-যত্ন করিতেছ; আর আমি তোমার একরত্তি আদর পাইবার অপেক্ষায় পাগল হইয়া আছি, অথচ তুমি আমাকে কোলে লইয়া আদরের পরিবর্ত্তে দুঃখকষ্টেরই আঘাতের পর আঘাত দিতেছ। তোমার জন্য আমি সংসারের সুখশান্তি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, তোমারই চরণে বসিয়া দিনরাত্রি কাটাইবার অবসর পাইব। জননী! তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, আমাকে একটাবার কোলে তুলিয়া লও। সংসারের কাঁটার আঘাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া আমাকে মরিতে দিও না।

সঙ্ঘের প্রসার।

শ্রমণ ও শ্রামণের।*

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

"যাও ভিক্ষুগণ, দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর—বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায় এই মহদ্ধর্ম্মের প্রচারব্রত গ্রহণ কর।' শাস্তার † এই আদেশবাণী সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া নবদীক্ষিত ষষ্টিসংখ্যক ভিক্ষু নবানুরাগের দীপ্ত-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত উল্কারাশির ন্যায় দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ স্বয়ং বহু ধর্ম্মান্বেষীর সাধন-ক্ষেত্র উরুবেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উরুবেলার প্রসিদ্ধ জটিল (তাপস) কশ্যপ ও তাঁহার

---

* শ্রমণ = ভিক্ষু। শ্রামণের = ভিক্ষুত্ব-লাভেচ্ছু শিক্ষানবীশ। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষা, ভিক্ষুত্বের পূর্ব্বে তেমনি শ্রমণের প্রব্রজ্যা দীক্ষা আবশ্যক।

† বুদ্ধের একটি উপাধি। অর্থ 'উপদেষ্টা' (শাস্ ধাতু)।

ভ্রাতৃদ্বয় সহস্রাধিক শিষ্য লইয়া একটি অগ্নিপূজক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কশ্যপের গৃহে অতিথি হইলেন। শুদ্ধবিচারে কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া তিনি ২২ বিভূতি সাহায্যে তাঁহার মস্তক অবনত করিলেন। কশ্যপভ্রাতৃত্রয় শিষ্যবর্গসহ বুদ্ধের শরণ লইলেন। এই অগ্নিপূজক সম্প্রদায়কে স্বমতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে তিনি অগ্নির একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন;— তিনি বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থই অবিরাম জ্বলিতেছে। আমাদের এই যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইহারাও নিরন্তর প্রদাহিত হইতেছে। কোন্ অগ্নিতে? রাগ, দ্বেষ, মোহ; জন্ম, জরা, মৃত্যু; শোক, দুঃখ, তাপ, নৈরাশ্য—এই গুলিই অগ্নি। ....এই সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, হে ভিক্ষুগণ, প্রকৃত সত্যান্বেষী ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর বীতরাগ হয়েন। এইরূপে বাসনা-বিমুক্ত হইয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। পবিত্রাচারী তিনি যথোপযুক্ত জীবনযাপনের তৃপ্তি লইয়া চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যুর পারে গমন করেন।"*

এই গভীর তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে নবীন ভিক্ষুগণ অর্হত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধ বিম্বিসার সমীপে কৃত-প্রতিজ্ঞার পূরণার্থে সদলবলে রাজগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজগৃহে অশ্বজিৎও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময়ে রাজগৃহে সঞ্জয় নামে এক প্রখ্যাতনামা পরিব্রাজক বাস করিতেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা পঞ্চশতাধিক ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নামীয় ভ্রাতৃদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অশ্বজিৎ একদিন ভিক্ষাসংগ্রহে বাহির হইয়াছেন। শারীপুত্র পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার শান্ত-মধুর মুখ দেখিয়া শারীপুত্র এককালে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অশ্বজিতের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে মনে করিয়া তিনি নীরবে দূরে দূরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অশ্বজিৎ যখন ভিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তদীয় আচার্য্য এবং উঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অশ্বজিৎ জিজ্ঞাসুর উজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "ভাই, আমি শিক্ষার্থীমাত্র—অল্পদিন হইল শাক্যমুনি তথাগত-প্রচারিত মহদ্ধর্ম্মের শরণ লইয়াছি। তাঁহার শিক্ষা বিশদভাবে তোমায় বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে মোটামুটি সারকথা—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
হেতুং তেসাং তথাগতো।
তেসাঞ্চ যো নিরোধো
এবংবাদী মহাসমনো॥

কারণ হইতে যে কার্য্যসমুদয় উৎপন্ন হয়, তথাগত সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তত্তাবতের নিরাকরণ কিরূপে সম্ভব মহাশ্রমণ তাহাই প্রচার করেন।

ক্ষেত্র উর্ব্বর হইলে অধিক কর্ষণের প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধাবান মেধাবী শ্রোতার নিকট অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক করে না। মুমুক্ষু শ্রোতার এককথাতেই সত্যধারণা হইল। অশ্বজিতের নিকট সত্যের সহজ সন্ধান পাইয়া সত্যসন্ধ শারীপুত্রের বদনমণ্ডল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মৌদ্গল্যায়নকে এই সংবাদ দিতে চলিলেন। তাঁহার আনন্দদীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া মৌদ্গল্যায়নেরা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শারীপুত্র তাহাদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। উভয়ে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন।

তাঁহারা গুরু সঞ্জয়কেও সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সম্মানের স্বপ্নাবিষ্ট সঞ্জয় দিব্যালোককে অভিনন্দিত করিতে পারিলেন না। লোকচক্ষে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হইবার নিদারুণ আশঙ্কা তাঁহার শ্রেয়োলাভের অন্তরায় হইল—স্বপ্নাবেশের জড়তা তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সঞ্জয়ের বহু শিষ্য প্রাজ্ঞ শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গী হইলেন।

বুদ্ধ তখন উপদেশ দানে রত। দূরে শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে দেখিবামাত্রই তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"ঐ দলের অগ্রভাগে যে দুইজন আসিতেছে, তাহারা আমার দুইজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইবে।" বুদ্ধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। নবাগত দল বিমুগ্ধ হইয়া এই উপদেশরত মহাশ্রমণের দিব্যামৃতবর্ষী মধুর বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাপস সঞ্জয়ের আশ্রমে প্রত্যাগমন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাঁহারা সকলে বুদ্ধকে গুরুপদে বরণ করিয়া সঙ্ঘভুক্ত হইলেন। মৌদ্গল্যায়ন সপ্তাহকাল মধ্যে এবং শারীপুত্র দুই সপ্তাহে অর্হত্ব লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন। শিষ্যবর্গ মধ্যে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠাসন দান করিলেন। ইহাতে পুরাতন শিষ্যগণ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু নবীন শিষ্যদ্বয়ের অনন্যসাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বুদ্ধ সকলকে শান্ত করিলেন।

মহোৎসাহে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। দিন দিন সংঘের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সারা রাজগৃহ-

* আদিত্যপর্য্যায়-সূত্র। এস্থলে সারসংক্ষেপ দেওয়া হইল।

ব্যাপী একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল। কিশোরপ্রাণ সর্ব্বদাই সতেজ ও সজীব। নবীনতার প্রেরণার জন্য তাহার দ্বার চির উন্মুক্ত। কখন কার অকূল-নিধির সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভাবিয়া সংসারীরা আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই বাধা ভাবের সেই প্রবল স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না। ভাববন্যা মগধসীমা অতিক্রম করিয়া দুকূল ভাসাইয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল। দলে দলে শুদ্ধোদনের দূতগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়া কেবল ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধিই করিলেন। অনুগত কালোদায়ী শাক্যমুনিকে শাক্যরাজ্যে যাইতে সম্মত করিয়া কপিলবস্তুতে অবশ্যম্ভাবী গৈরিক উপপ্লাবনের নিমিত্তমাত্রই হইলেন।

কপিলবস্তুর অনেকে 'একূল ওকূল দুকূল রেখে' 'দুধের বাটী' খাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আবার যৌবন-বীর্য্যবান অনেকের পক্ষে দুকূল রক্ষা অসম্ভব হইল। প্রাচীনগণের নিবিড় রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের সেই মহাবাণী কপিলবস্তুর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল।

শাক্যরাজ্যে অবস্থানের আজ দ্বিতীয় দিন। রাজা শুদ্ধোদন ও রাজ্ঞী মহাপ্রজাপতি গৌতমী কুমার নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক ও অনিন্দ্যসুন্দরী জনপদ-কল্যাণীর সহিত তাহার উদ্বাহব্যাপারে একান্ত ব্যস্ত। আপন ভ্রাতা সংসারাবদ্ধ হইয়া জরামরণের করগত থাকিবে, বুদ্ধ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নন্দের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নির্ব্বাণ-মুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আরব্ধ অভিষেকোৎসবাদির নিন্দা করিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "বাসনার নাশ, ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা, চতুরার্য্য-সত্যের জ্ঞান, নির্ব্বাণের ধারণা—এই সকলের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ উৎসব"। তিনি আপনার ভিক্ষাপাত্র নন্দের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আবাস-স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নন্দের ইচ্ছা হইল ভিক্ষাপাত্র প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু সহসা তাহা পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ন্যগ্রোধ-বনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের দীর্ঘসময়ব্যাপী উপদেশের ফলে নন্দ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। শারীপুত্র তাঁহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু জনপদ-কল্যাণীর অপরূপ রূপলাবণ্য অন্তরে জাগিয়া জাগিয়া নন্দকে অস্থির করিয়া তুলিল। বিষণ্ণ মনে তিনি কল্যাণীর নিকট ফিরিয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতেন। সকল উপদেশ-বচন ব্যর্থ হইল দেখিয়া বুদ্ধ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। ঋদ্ধিবলে নন্দের সম্মুখে এক অপ্সরা-মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে একান্তমনে নির্দ্দিষ্ট পন্থানুরূপ আচরণ করিলে চরমে এই কন্যালাভ ঘটিবে। কল্যাণী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ পত্নীলাভের আশায় নন্দ সোৎসাহে ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত আসক্তি অতিক্রম করিয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

বুদ্ধের কপিলবস্তুতে অবস্থিতির সপ্তম দিবসে হঠাৎ যশোধরার মনে এক বাসনা জাগিল। তিনি সপ্তম-বর্ষীয় পুত্র রাহুলকে শ্রেষ্ঠ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বলিলেন—"যা, তোর পিতার নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি প্রার্থনা কর্"। বালক ভাবিল পিতামহ শুদ্ধোদনের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, কারণ অন্য কোন পিতার অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। যশোধরা পুত্রকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া বাতায়ন-পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐ যে কান্তিমান ভিক্ষু, উঁনিই তোর পিতা—উঁহারি নিকটে প্রার্থনা কর্‌বি"।

বুদ্ধ তখন আহার করিতেছেন। রাহুল তাঁহার নিকট গমন করিয়া ডাকিল 'পিতা'। বুদ্ধ একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া পুনরায় আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। আহারকাল পর্য্যন্ত রাহুল মৌনভাবে অপেক্ষা করিল। তদনন্তর সে বুদ্ধের অনুসরণ করিয়া বলিল—"পিতা, আমার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি দিন"। সস্নেহ দৃষ্টিতে বুদ্ধ এই নির্ভীক বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর শারীপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ইহাকে শ্রামণের-দীক্ষা দান কর।" রাহুল সোল্লাসে সংঘবদ্ধ হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ শারীপুত্রের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদশ্রবণে শুদ্ধোদন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পুত্র নন্দ ও পৌত্র রাহুলের শোকে অধীর হইয়া তিনি বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"আর কখনও কোন বালককে পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত সংঘবদ্ধ করা হইবে না"।

অতঃপর বুদ্ধ কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।* পথে তিনি মল্লরাজ্যে 'অনুপিয়' নামক স্থানে কতিপয় দিবস অবস্থান করিলেন।

আনন্দ, অনিরুদ্ধ, মহানাম, ভদ্রিক, ভৃগু, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যকুমারগণের বুদ্ধের উপদেশশ্রবণে ইতিপূর্ব্বেই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহারা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পিতামাতা ও স্বজনবর্গের সমক্ষে ভিক্ষুত্ব-গ্রহণের করুণ দৃশ্য তাঁহাদের কল্পনায় আঘাত

* সিংহলী বৌদ্ধগণ দাবী করেন যে, এইসময়ে বুদ্ধ একবার সিংহলে গিয়াছিলেন। See "Manual of Buddhism" —Spence Hardy pp. 212 ff.

করিতেছিল। কিন্তু বৈরাগ্য কঠোরতার দাবী লইয়াই আসিয়া উপস্থিত হয়। দাবী পূরণ করিতে না পারিলে, অন্ততঃ সহৃক্ষমতা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়,—বামহস্তে অশ্রু মুছিয়া দক্ষিণহস্ত তাহাকে সমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কুমারগণ বুদ্ধের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজনাপিত উপালীকে পথপ্রদর্শক-রূপে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গোপনে অনুপিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সকলে আপনাদের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি উপালীকে উপহার দিলেন। উপালী উপহার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—কুমারগণকে সামান্য বস্ত্রে দীনভাবে দেখিয়া তাঁহার অন্তরেও বৈরাগ্য জাগিল। সকলে বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন এবং আপনাদিগকে নিরভিমানী করিতে সর্ব্বপ্রথমে নাপিত উপালীকে দীক্ষিত করিতে অনুরোধ করিলেন। যথারীতি সকলের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন-কয়েক পরেই শ্রাবস্তীর বিখ্যাত বণিক অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধদর্শনে আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন। অনাথপিণ্ডিকের আমন্ত্রণ-রক্ষার্থে তাঁহাকে কোশল-রাজ্যে গমন করিতে হয়। শ্রাবস্তী হইতে ফিরিয়া তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কলণ্ডক-নিবাপে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষা যাপন করিলেন। বৈশালীর মহামারী উপশমিত করিয়া তিনি পুনরায় রাজগৃহেই ফিরিয়া আসেন এবং উপর্য্যুপরি চারি বৎসরকাল তথায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অতিবাহিত করিলেন।

ধীরে ধীরে প্রচারের উত্তেজনা ও উন্মাদনা শমিত হইয়া আসিল। এখন হইতে প্রচারকার্য্য ধীর ও স্থির গতিতে চলিতে থাকিল। বুদ্ধও নিজের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী নিয়মবদ্ধ করিয়া লইলেন। কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য তিনি দিবসকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন,—১। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বভাগ; ২। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরের দিবাভাগ; ৩। রাত্রি, প্রথম-ভাগ; ৪। রাত্রি, মধ্যমভাগ এবং ৫। রাত্রি, শেষভাগ।

অতি প্রত্যূষে শয়নাগার ত্যাগ করিয়া তিনি হাতমুখ প্রক্ষালন করিতেন। প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। তৎপর ভিক্ষার্থে নগরে বহির্গত হইতেন। কোনদিন তিনি একাকী বাহির হইতেন, কোনদিন কোন ভিক্ষুদলের সঙ্গে যাইতেন। কিন্তু ভিক্ষা তাঁহাকে প্রায়ই করিতে হইত না। কোন না কোন গৃহপতি প্রায় প্রত্যহই পথ হইতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

কোন গৃহস্থের দান গ্রহণ করিলে প্রতিদান স্বরূপে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভোজনান্তে তিনি একস্থানে উপবেশন করিতেন। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তিনি উপস্থিত সকলের মানসিক ভাব পর্য্যাবলোকন করিয়া তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। উপদেশশ্রবণের ফলে কেহ-বা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিত, কেহ-বা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইত। অবশিষ্ট সকলকেই বুদ্ধের প্রতি অন্ততঃ একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া ফিরিতে হইত। উপদেশান্তে তিনি বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

বিহারে তাঁহার বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিয়া তিনি ভিক্ষুগণের আহারাদি সমাপানকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। সকলের আহারাদি সুসম্পন্ন হইলে তাঁহারা তথায় সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা উপদেশচ্ছলে মুক্তিচেষ্টায় উৎসাহিত করিতেন। কেহবা তখন তাঁহাকে ধ্যান-সাধনাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। যথোপযুক্ত উত্তরদানে তিনি প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট করিতেন। অতঃপর সকলে তাঁহার পদবন্দনা করিয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, তিনিও স্বপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতেন। কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে শয়ন অথবা উপবেশন করিয়া থাকিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেন।

যে স্থানে তিনি বাস করিতেন, তথাকার যত অধিবাসী তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণের অভিলাষে দিবসের শেষভাগে আসিয়া সমবেত হইত, সন্ধ্যাগমন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবগাহন করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রে ধ্যানপ্রকোষ্ঠে গমন করিতেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহাকে দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতেন। ধ্যানান্তে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিত সকলকে উপযুক্ত উত্তর দিয়া সাহায্য করিতেন। এই ভাবে রাত্রির প্রথম ভাগ কাটিয়া যাইত।

ভিক্ষুগণ যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাত্রির মধ্যভাগ তিনি দেবগণের সহিত অতিবাহিত করিতেন।

রাত্রির শেষভাগে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। বহুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকার শ্রান্তি-নিবারণার্থে কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া, অল্প সময়ের জন্য শয্যাগ্রহণ করিতেন। অল্পক্ষণ পরেই শয্যা ত্যাগ করিয়া

পুনরায় আসনে উপবেশন করিতেন এবং রজনীর শেষ অংশ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। *

বুদ্ধের এই নিয়মিত কার্য্যপ্রণালী সংঘের প্রসার ও সংঘের ভিত্তি দৃঢ় করিবার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হইল। কেবল এক ত্যাগী কর্ম্মীদল লইয়া কোন সংঘ চলিতে পারে না। যাহাদের জন্য এই কর্ম্মীসংঘের প্রচেষ্টা, এবং যাহাদের অর্থানুকূল্যে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা, তাহারা যদি ইহাকে না চায়, তাহারা যদি ইহার বাস্তব প্রয়োজন অনুভব না করে, তবে ইহার জীবন নিশ্চয়ই শঙ্কাজনক। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক বুদ্ধের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রণালী এই সমস্যাপূরণে খুবই কার্য্যকরী হইল।

রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তী হইয়া নবমবর্ষায় কৌশাম্বীতে † উপস্থিত হইলেন। নিকটস্থ ঘোষিতারামে তিনি বর্ষাবাস করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু একটি অপ্রিয় ঘটনা তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিল। বিনয় সম্পর্কে কোন জটিল প্রশ্ন লইয়া ঘোষিতারামের ভিক্ষুগণের মধ্যে একটি বিসংবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদভঞ্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া বুদ্ধ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মূর্খগণের মধ্যে অনর্থক শক্তির অপচয় অনুচিত বিবেচনা করিয়া, তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিবেন, স্থির করিলেন। কৌশাম্বী ত্যাগ করিয়া তিনি বালকলোনকার গ্রামে গমন করিলেন।

এস্থানে স্থবির ভৃগু এবং দিন কয়েক পরে অনিরুদ্ধ, নন্দীয় ও কিম্বিল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলে পারিলেয্যক নামক স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য রক্ষিতবনে শান্তিময় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

একটী হস্তী স্বীয় দলকর্ত্তৃক বিশেষভাবে বিড়ম্বিত হইয়া এই বনে আসিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে বাস করিতেছিল। বুদ্ধ তাহার অবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহাকে বড় আদর করিতেন।

কিন্তু বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুগণ অধিককাল সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরেই সকলের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। তদুপরি উপাসকগণও তাঁহাদিগকে হীনচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতীকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া বুদ্ধের সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বুদ্ধ সম্প্রতি শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বুদ্ধের নির্দ্দেশ মত উভয় দল বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইলেন।

একাদশ বর্ষায় তথাগত পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন সমীপবর্ত্তী একনালাগ্রামের এক ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে ক্ষেত্রাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ কাশীভরদ্বাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। ভিক্ষুবেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—"আমি ভূমি কর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তল্লব্ধ শস্যে জীবন ধারণ করি; তুমিও তদ্রূপ কর না কেন?" বুদ্ধ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ করি, বপন করি এবং ক্ষেত্রজ ফল লাভ করি"। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বুদ্ধ কহিলেন—"ধর্ম্ম আমার ক্ষেত্র; সংসাররূপ আগাছা আমি উন্মূল করি; বিজ্ঞান আমার লাঙ্গল, পবিত্রতা-বীজ আমি বপন করি; ধর্ম্মানুসরণই আমার কর্ষণক্রিয়া এবং নির্ব্বাণ আমার কৃষিফল"। এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কৃষক-ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল—সংসার-মোহ অতিক্রম করিয়া তিনি সংঘভুক্ত হইলেন।

বর্ষান্তে বুদ্ধ পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সঙ্কাশ্য পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষায় শ্রাবস্তীনগরে ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষায় রাহুল বিংশবর্ষ বয়সে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণপদবীতে উন্নীত হইলেন। * সপ্তদশ বর্ষায় বুদ্ধ রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বর্ষাশেষে তিনি পুনরায় প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইলেন এবং উপর্য্যুপরি কয়েক বর্ষ শ্রাবস্তীতে ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতিবাহিত করিলেন। বিংশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থানকালে তীর্থকগণ এক নারীহত্যায় লিপ্ত করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় নিজেরাই বিশেষরূপে অপদস্ত হয়েন।

এই বর্ষার প্রধান ঘটনা দস্যু অঙ্গুলিমালের পরিশোধন। কোশলের রাজপুরোহিত ভার্গবের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যে রাত্রে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে রাত্রে রাজ্যের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এক অদ্ভুত দীপ্তিতে জলিয়া উঠে। ভার্গব সন্ত্রস্ত হইয়া স্বপ্নফল-বেত্তাকে আহ্বান করিলেন। গণনার ফলে জানিতে পারা গেল, জাতক রাজ্যসন্ত্রাসী দস্যু হইবে। ভীত ভার্গব রাজার নিকট অশুভকারী পুত্রের প্রাণনাশের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। প্রবল-প্রতাপ কোশলরাজ স্মিতহাস্যে পুরোহিতকে অভয় দিয়া পুত্রকে যথোচিত ভাবে লালন-পালন করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মনে অহিংসা-ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য, ভার্গব তাহার নাম রাখিলেন 'অহিংসক'।

বাল্য অতিক্রম করিয়া অহিংসক বিদ্যাশিক্ষার্থে

* সুমঙ্গল বিলাসিনী—বুদ্ধ ঘোষ।

† বর্ত্তমান কোসাম, এলাহবাদের নিকটে।

* বিংশবর্ষের পূর্ব্বে উপসম্পদা দীক্ষা দেওয়া বিনয়-বিরুদ্ধ।

তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলেন। তাহার তীক্ষ্ণ মেধা অচিরেই সকল শিক্ষার্থিগণের ধীশক্তিকে মলিন করিয়া দিল। শারীরিক বলেও তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সহপাঠিগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। নানা কুটিল উপায়ে তাহারা তাহার অহিতাচরণ করিবার প্রয়াস পাইল। অনেক ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের পর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে গুরু-পত্নীর সহিত ব্যাভিচারের অভিযোগ উপস্থিত করিল। ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টাও তাহারা অহিংসকের প্রতি আচার্য্যকে বিরূপ করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আচার্য্যদেবের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা তাঁহাকে অভ্রান্তপথে রাখিতে অসমর্থ হইল। অহিংসক ইহার কিছুই জানিতে পারিল না, কারণ কাহারও এমন সাহস ছিল না যে, তাহার সম্মুখে ইহা আলোচনা করে। অধ্যাপক অহিংসককে বিতাড়িত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"বৎস, সাধারণ বিদ্যা সমস্তই তোমার অধিগত হইয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে তোমায় সহস্র মানবের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটি অঙ্গুলি আনিয়া আমায় উপহার দিতে হইবে"। বিদ্যা-লাভের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় অহিংসক এই আদেশ সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

এক বনের ভিতর রাজ্যের প্রধান প্রধান অটটি রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। অহিংসক সেই বনে অবস্থান করিয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অঙ্গুলি যখন সঞ্চিত হইল, তিনি সেইগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া মালারূপে গলায় ধারণ করিলেন। লোকে দস্যুর নাম রাখিল 'অঙ্গুলিমাল'। দিন দিনই মাল্যের অঙ্গুলি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে সমগ্র কোশলব্যাপী প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। নৃপতি আর নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। সৈন্যসহ দস্যুগণকে দমন করিবেন স্থির করিলেন। এই দস্যু যে কে ব্রাহ্মণ ভার্গব ও তাঁহার পত্নীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। মাতৃহৃদয় পুত্রের প্রাণনাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতা উপায় চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অহিংসকের উল্লাসে তখন একটু বিষাদ-ছায়া পড়িয়াছে। আর একটিমাত্র অঙ্গুলি হইলেই তাঁহার সহস্রাঙ্গুলি পূর্ণ হয়, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আজ কোন মানুষের সন্ধান মিলিতেছে না। লোক এপথে চলাচল বন্ধ করিয়াছিল।

করুণার অবতার বুদ্ধ আজ ধ্যানযোগে অদ্ভুত দস্যুর সমস্ত কথাই অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন অহিংসক আজ পিতামাতা বিচার করিবে না, মাতৃ-অঙ্গুলিতেই—সে তাহার মালা পূর্ণ করিবে। অবিলম্বে তিনি বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যত লোকের সহিত দেখা হইল, সকলেই তাঁহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। কিন্তু কাহারও বাধা না মানিয়া তিনি শান্তমনে অগ্রসর হইলেন।

ভিক্ষুক দেখিয়া অঙ্গুলিমালের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। শাণিত ছুরিকা হস্তে সে ভিক্ষুর পশ্চাতে ধাবিত হইল। কিন্তু ভিক্ষুকে ধরিতে সমর্থ হইল না। পরি-শ্রান্ত হইয়া অঙ্গুলিমাল তাঁহাকে থামিতে অনুরোধ করিল। ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে তাহাকেও থামিতে বলিলেন।

বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। হত্যার কথা ভুলিয়া গিয়া সে একবার ভিক্ষুর সৌম্য শান্ত মুখের প্রতি চাহিল। অন্তরে দেবতা জাগিয়া উঠিল। দস্যু শাস্তার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

দস্যুকে আক্রমণের পূর্ব্বে কোশলরাজ একবার বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথায় কথায় অঙ্গুলি-মালের প্রসঙ্গ উঠিল। বুদ্ধ কহিলেন, "আচ্ছা সে যদি এই সঙ্ঘভুক্ত হয়, তবে কি করিবেন ?"

"তৎপ্রতি শ্রমণোচিৎ সম্মান দেখাইব।"

কথাগুলি প্রসেনজিতের কণ্ঠ হইতেই নিঃসৃত হইল, কারণ সমগ্র রাজ্য-সন্ত্রাসী দস্যুর এরূপ পরিবর্ত্তন তিনি কল্পনাও করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুবেশী দস্যুকে যখন যথার্থই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি তাহার দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া ভয়চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অভয় পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"ধন্য বুদ্ধ!"

কিন্তু ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও অহিংসকের দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। ভিক্ষায় বহির্গত হইলেই কোশলবাসিগণ তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। অহিংসক নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এইরূপে তাঁহার কৃত পাপ ক্ষালিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বকৃত রোমাঞ্চকর হিংসাব্যাপার স্মরণ করিয়া তিনি স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িতেন। তথাগত তাঁহাকে সস্নেহে বুঝাইতেন—"সে সকল তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত। তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ। এজন্যে তুমি শুদ্ধ।"

চা-পান, না বিষপান?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩৩ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে যদি ১৬॥০ কোটী ভারতবাসী, অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক প্রত্যহ ১ পয়সার চা পান করে বলিয়া ধরা যায়, তবে প্রতিদিন ২৫ লক্ষ টাকা, মাসে ৭॥০ কোটী টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৯০ কোটী টাকা আমরা চা-পানে নষ্ট করি। এদিকে ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মাত্র। চা-বিষ প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগি। চা-পানের ফলে ভাত প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য বেশী খাওয়া যায় না। ১ পয়সা চায়ের লোভে আয়ুহ্রাসের ব্যবস্থা করি। (সঞ্জীবনী ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। আমাদের বেশ মনে পড়ে, দেশে, অন্তত এই কলিকাতায় চা কি প্রকারে ছুঁচের আকারে ঢুকিয়া এখন ফালের আকারে বাহির হইতেছে। এক সময়ে দেখা গেল, চায়ের কাটতি বড়ই কমিয়া গিয়াছে। ইংরাজী বণিকমহলে এবং সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন পড়িল, কিসে চায়ের কাটতি বাড়ানো যায়। সেই সময়ে Tea-cess আরম্ভ হইল কিনা মনে পড়ে না, অন্তত Tea-cess হইতে কাটতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করাই স্থির হইল। তখন এক মস্ত বিলাতী কোম্পানি, এই আন্দোলনের নেতৃস্বরূপে ভার লইলেন। প্রথম প্রথম এক মহা রব উঠিল যে, যে কেহ চায়ের দোকান খুলিবে সাহেবরা সেই দোকানের ভাড়া দিবে, যদি লোকসান হয় তাহা পুরাইয়া দিবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবে। এত প্রলোভন এই দুর্ভাগা দরিদ্র দেশের কয়জন অতিক্রম করিতে পারে? সহরের চারিদিকে হু-হু করিয়া চায়ের দোকান খুলিল। যখন এই সমস্ত দোকানের পসার বেশ জমিয়া গেল, তখন শুনি ১ পয়সায় দুই প্যাকেট চা, এবং কিছুদিন পরে ১ পয়সায় ১ প্যাকেট খুব ভাল চা বিক্রয় হইতেছে। এই pice-packet চায়ের কি কাটতি! যে চায়ের জন্য ধনীরা লালায়িত, সেই চা যখন সকলেই এত সস্তা পাইতে লাগিল, তখন কি আর রক্ষা আছে?

চায়ের দোকানে চা তো দিনরাত চড়ানোই থাকে—মধ্যবিত্ত লোকেরা দোকানে বসিলেন, পাঁচজনের সঙ্গে খোস গল্প অশ্লীল তামাসা জুড়িয়া দিলেন; ইতিমধ্যে দোকানদার সেই সিদ্ধ চায়ের জল ঢালিয়া তাহাতে টিনের অসার দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। চা-পায়ী ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তিনি চা খাইতেছেন, না তীব্র বিষ গলাধঃকরণ করিতেছেন। ইহার উপর আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেক চা-বিক্রেতা একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ সেই চা-কুণ্ডে ফেলিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। ইহার ফলে চা-সেবী ত্রিবিধ স্বর্গসুখ লাভ করেন—[১] ঘরের কড়ি স্বেচ্ছায় উড়াইয়া দেওয়া, [২] বিষ পান করা এবং [৩] মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া। চা-পানের একটু মজা আছে। চা-পানের ফলে অজীর্ণ রোগ চোরের মত দেহে প্রবেশ করে এবং দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; দুর্ব্বলতা আসিলেই চায়ের ন্যায় mild stimulant বা নরম উত্তেজক কিছু দরকার হয়—এইরূপে রোগেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চা-পান না ছাড়িলে দাঁড়াইবে এই যে, যে দিক দিয়া হোক, চায়ের দাম হিসাবে অথবা রোগের ঔষধ হিসাবে, বিলাতকে পয়সা দাও, দেশে দারিদ্র্য আন এবং জীবন্মৃত হইয়া দিন যাপন কর।

আজকালকার কয়জন জানেন, বোধ হয় কেহই জানেন না যে, চা-বাগানের কুলিদের প্রতি চা-কর ইংরাজগণ কি ভীষণ অত্যাচার করিত। আজকাল যেমন নারীধর্ষণের ব্যাপার সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায়, সেকালেও চা-কর ইংরাজদের সবুট পদাঘাতে কুলিদিগের প্লীহাফাটা, কথায় কথায় বিচারে বে-কসুর খালাস পাওয়া এবং কুলিরমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার-কাহিনী সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যাইত। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত নির্ভীকহৃদয় ও শক্তিমান দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি স্বয়ং কুলি হইয়া চা-বাগানে কাজ করিয়া স্বচক্ষে কুলিদের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সঞ্জীবনী আজ নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইছে, গাঙ্গুলি মহাশয়ের ঐ সকল "কুলি-কাহিনী" সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ সঞ্জীবনীর অঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিল। সঞ্জীবনীর আন্দোলনের ফলে চা খাওয়া খুব কমিয়া গিয়াছিল। তখন সে দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। তখন আড়কাঠির বে-আইনী কুলি-চালানোর বিরুদ্ধে আইন হইল; পূর্ব্বের অপেক্ষা বিচার-বিভ্রাট অনেক কমিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি ও কুলিরমণীদের প্রতি অত্যাচারও অনেক কমিয়া গেল। অনেক পুষ্প সুগন্ধবিস্তারে সুখ দান করিয়া লোকদৃষ্টির অন্তরালে ঝরিয়া যায়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাধারণ্যে দ্বারিক গাঙ্গুলি নামে সুপরিচিত—মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় কুলিদের প্রতি অত্যাচার প্রশমিত হইল, কিন্তু কয়জন লোক তাহা অবগত আছে? আমার মনে হয়, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক কুলির নিকট ১ পয়সা করিয়া লইলে সহজেই এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা যাইতে পারে।

চা-পানের কুফল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস গত অগ্রহায়ণের 'বঙ্গলক্ষ্মীতে' সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। আমরা

তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—উহা আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

"চা-পানের সর্ব্বনেশে অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়—দশ-বারো বার চা নইলে চলে না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা ভয়ানক অনিষ্টকর। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেখলেন বিলাতে চায়ের জন্য স্বাধীন চীনের উপর নির্ভর করতে হয়, তাঁরা অধীন ভারতে চা উৎপন্ন করবার মতলব আঁটলেন। ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতে চায়ের চাষ করবার জন্য চীন থেকে চা এবং চীনা শ্রমজীবী আনালেন। তিনি সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু চায়ের অপব্যবহারের দরুণ কত পরিবারের যে কত মর্ম্মদাহ ভবিষ্যতে হতে পারে, তা তিনি অনুভব করেন নাই। * * * ১৮৫২ সালে আসামোৎপন্ন চা চীনের চায়ের সমকক্ষ হয়েছিল। প্রথমে দেশীয় লোকেরা চা খেতেন না; এখন চা একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। ১৮৬৪ সালে এদেশ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। এখন প্রতি বৎসর ৫৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। দেশে চা ধরাবার জন্য এণ্ড্রুল কোম্পানী কেরাণীদের টিফিনের ছুটির সময় পাঁচ সিকে খরচ করে চা খাওয়াত; তারপর খরচ করত দশ আনা, তারপর চারি আনা। তারপর যখন দেখলে নেশা ধরেছে, আর কিছুই খরচ করতে হল না। এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলে চা খায়। মুটে মজুর সকলেরই এখন চা না খেলে চলে না"।

আপাতত বোধ হয়, এত বড় ব্যবসায়ে ভারত লাভবান হয়; কিন্তু লাভ কত এদেশে থাকে, আর বিদেশে কত যায়, তার খতিয়ান দেখিলে দেখা যায় যে, যদি বা ভারতের কিছু লাভ থাকে, সে লাভ অতি সামান্য। "সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে ৪৮ কোটী টাকা মূলধন খাটছে। এর মধ্যে ৩৭ কোটী টাকা বিলাতী। অবশিষ্ট মূলধনের মালিক অধিকাংশ বিলাতের লোক। এদেশের মালিক অতি অল্প। লাভ প্রায় শতকরা একশত কি দুইশত। আমাকে একজন চা-বাগানের মালিক বলেছিলেন—এবৎসর দুর্ব্বৎসর, লাভ শতকরা পঞ্চাশ মাত্র। যদি শতকরা পঁচিশও ধরা যায়, ৩৭ কোটী বিলাতী মূলধনের দরুণ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৯।০ কোটী টাকা যায়। তা ছাড়া বিলাতী ম্যানেজারদিগকে প্রায় ৫ কোটী টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যবসায় দরুণ ভারতবর্ষে বিলাতী বণিকদিগকে প্রতি বৎসর ১৪।০ কোটী টাকা দিয়ে থাকে। সরকারী বিবরণী বলে—৩৪০ চা বাগানে ৩১৫ জন বিদেশী ম্যানেজার।

"প্রায় ৮॥০ লক্ষ শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদেশী বণিকদের অর্থকোষ পূর্ণ করছে। তার প্রতিদানে পায় মাথা পিছু ৭॥০ টাকা। দৈনিক চারি আনাতে কি একটা মানুষের জীবন ধারণ চলে? অত্যাচার—অনাচারের কথা ছেড়ে দাও, ইতিহাস তার সাক্ষী। স্থানে স্থানে সরকারী বে-সরকারী রেলওয়ে ষ্টেশনে 'টী-সেস এসোসিয়েশনের' অনুরোধ পত্র ঝুলছে। এক পেয়ালা চা খাও, কোন কষ্ট থাকবে না। মাতাল হবে না অথচ মদ্যানন্দ পাবে, শরীর সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম হবে, ইত্যাদি। সহসা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদেশী বণিকদের এত উদ্বেগ কেন? সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"চায়ের দরুণ বছরে ১৪।০ কোটী তো তাঁদের উদরে যায়, তা ছাড়া এই ভারতেই ৪ কোটী টাকার চা বিক্রী হয়। তা ছাড়া ঐ চায়ের মোহিনী শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে বিদেশী-দেশী জীবননাশী দুটী পদার্থ আবশ্যক—বিলাতী টিন-বদ্ধ দুগ্ধ এবং জাভার চিনি। যার যত নেশা তার তত বেশী কড়া চা এবং দুধ ও চিনি চাই। টিনভরা দুধের দরুণ ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা গিয়েছিল; ১৯২৬-২৭ সালে সেই অঙ্ক উঠেছিল ৭৫ লক্ষের কোঠায়। এক পাউণ্ড চা প্রস্তুত করতে হলে ৩½ ৪ সের চিনি চাই। বিদেশী চিনি নইলে অনেকের মুখে চায়ে তার লাগে না। ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী চিনির দরুণ বিদেশে প্রতিবৎসর এদেশের ৪ কোটী টাকা বেরিয়ে যায়. দেশী চিনি ময়লা বলিয়া আমরা ঘৃণা করি। তা ছাড়া, এই দেশী চিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীতেও প্রস্তুত হয় না। জাহাজে বিদেশী চিনির যে সব বস্তা বিক্রী হয়, সেই বস্তায় চিনির যে সব ময়লা লেগে থাকে, তাহাই জ্বাল দিয়ে চিনি বের করে যে অপরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম দেশী চিনি। এই তো গেল দুধ-চিনির কথা। চায়ের জন্য বিলাতী পাত্র চাই। প্রতি বৎসর ভারতে ১ কোটী টাকার বিলাতী পেয়ালা আসে। এর এক-তৃতীয় কি এক-চতুর্থ অংশও যদি চায়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলেও অন্তত ২৫।৩০ লক্ষ টাকা এই বাবদে বিলাতে যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বশুদ্ধ চায়ের দরুণ দেশ থেকে ১৯ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হচ্ছে।

"চা স্বাস্থ্যেরও কিরূপ হানিকর তাহাও বলি। চা চলতি হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-জাতি বেশী বলবান ও সুস্থ ছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময় দশলক্ষ ইংরাজ সৈন্য হবার অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য তার কারণ শুধু চা নয়। চা খেতে-খেতে যখন নেশা জন্মে তখন

খুব কড়া চা নইলে চলে না। এই প্রকার কড়া চায়ে যে বিষ থাকে, তা থেকে জন্মায় পাকাশয়ের প্রদাহ, অম্বল, অজীর্ণতা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ প্রভৃতি। কেহ কেহ ১৪।১৫ পেয়ালা চা খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দেয়। কেহ কেহ এত গরম চা খায় যে জিভ পুড়ে যায়, এই অত্যুষ্ণ চায়ের দরুণ পেটের ভিতর ঘা হয়। আজকাল অনেকের মধ্যে এই রোগটা প্রবল হয়েছে। তার দরুণ পেট কেটে চিকিৎসা করতে হয়।

"আর এক বিপদ, সংক্রামক রোগ। পাত্রগুলি তো আর গরম জলে সিদ্ধ করে বিষমুক্ত করবার অবকাশ বা অভিপ্রায় থাকে না। গরমি বা যক্ষ্মারোগী চুমুক দিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, তার পরেই আর একজন এসে সেই পাত্রে চা পান করে রোগটা সঞ্চয় করল।

"আর একটা দিক আছে সঙ্গদোষ। ঐ চায়ের দোকানে যত বকাটে ছেলের আড্ডা হয়। ঐ খানেই যত অসৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি"।

এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী কোম্পানীর কমবেশী প্রায় ৫০টা সিন্ধুক চা নষ্ট করা হইল। ইহার কারণ কি? কারণ—ঐ সিন্ধুক-গুলির চায়ে—আ—র্সে—নিক বিষ পাওয়া গিয়াছিল!! ইহা কি প্রকার ভয়াবহ কথা, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমাদের প্রশ্ন এই যে, খুব অল্প পরিমাণে ঐ বিষ চায়ের সঙ্গে মিশাইলে কি উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল হয়, অথবা চায়ে সহজে পোকা ধরে না, অথবা নেশা ভাল জমে? এতগুলি সিন্ধুকে আর্সেনিক পাওয়ায় আমাদের সন্দেহ হয় যে, ইহা দৈবাতের কথা নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশ্রিত। তবে, হইতে পারে যে, এই কয়টা সিন্ধুকে উহা কিছু বেশী পরিমাণে মিশানো হইয়াছিল—এই বেশীটুকু হয়তো দৈবাতের কাজ হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, কর্পোরেশন এই আর্সে-নিক মিশ্রিত হইবার মূল অনুসন্ধান করুন। করিলে শোনা যায়, চায়ের কারখানায় নাকি অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, আর একটা চায়ের মস্ত বড় কোম্পানি তাঁহাদের চায়ে আফিমের জল ছিটাইয়া দিতেন—তাহা হইলে একবার যাঁহারা তাঁহাদের চা খাই-বেন, তাঁহারা সহজে আর তাঁহাদের চা ছাড়িয়া অন্য চা ধরিতে চাহিবেন না। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি যখন পাঠ্যাবস্থায় এক হোষ্টেলে থাকিতেন, তখন একজন সেই হোষ্টেলের সম্মুখে এক চায়ের দোকান খুলিল। দোকানে লোকে লোকারণ্য—এমন চা নাকি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তখন বন্ধু—ইনি চা খাইতেন না—কৌতূহলবশতঃ সন্ধান লইতে উদ্যত হইলেন—এত প্রশংসার কারণ কি? শেষে কোন প্রকারে চা যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, চায়ের জল ফোটাইবার সময়ে উহাতে "পোস্তর ঢেঁড়ি" (আফিমের ফলের বীচি) ফেলিয়া দেওয়ার কারণেই ঐ চায়ের প্রতি ছেলেদের এত ঝুঁকিবার কারণ। উহা জানিয়া ছেলেরা ঐ চায়ের দোকান পরিত্যাগ করিল।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ মূল চা-কুণ্ডে ঢালিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত হইল এবং তাহাই চা-পায়ীদের পয়সার বিনিময়ে উপাদেয় পেয়রূপে বিতরিত হইতে লাগিল। শুধু চা কেন? আমি এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া-ছিলাম—সেখানে লেখা আছে—চা, ঘোলের সরবত প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকাল—একজন এসে ঘোলের সরবৎ চহিল। দোকানদার ঘোলের নামধারী সাদা বিষ ঢালাঢালি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইল, মেথরশ্রেণীর—তাহা না হইলেও ঐ প্রকার কোনও নিতান্ত নীচশ্রেণীর নিঃসন্দেহ। সে খানিকটা খাইয়া অল্প কিছু অংশ গেলাসে রাখিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার সেই পরিত্যক্ত অংশটুকু নিঃসঙ্কোচে ঘোলের কুণ্ডের মধ্যে ঢালিয়া রাখিল। ইতি-মধ্যে কেরাণীশ্রেণীর এক দুর্ভাগ্য জীব আসিয়া যেই ঘোলের সরবৎ চাহিল, দোকানদার অমনি তাহার সেই অমৃতভাণ্ড বা ঘোলকুণ্ড হইতে অমৃত ঢালিয়া তাহাতে পচা গোলাপী আতর ও একটু গোলাপী রংয়ের বিষ ঢালিয়া এক গেলাস বিষ প্রস্তুত করিয়া দিল। কেরাণী বাবুটীও উহা পান করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে সংক্রামক রোগের বীজ যে কি প্রকার দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কয়জন অভিভাবক লক্ষ্য করিয়া রাখিতেছেন?

প্রবীণ ডাক্তার সুন্দরীমোহন বাবু বলেন যে চায়ের বদলে গম কড়া করিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিয়া দাও; তাহাই ফুটন্ত জলে দিয়া দুধ ও গুড়ের সঙ্গে খাও। চিনির ভিতর সার কিছুই নাই। তদপেক্ষা গুড় শতগুণে পুষ্টিকর। আমরাও শুনি যে, আজকাল অল্প খরচে চিনির মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য স্যাকারীণ [saccharine] ব্যবহার হয়। পড়িয়াছিলাম যে, এই পদার্থ বেশী ব্যবহার করিলে কর্কট [cancer] রোগ হয়।

গম গুড়ার ব্যবস্থা করিলে চর্ব্বি-মিশানো বিস্কুটও ব্যবহার করিতে হয় না। সুন্দরীমোহন বাবু যে ভাবে গম গুঁড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিলাতী grapenut নামক পদার্থের ব্যবহারেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে

প্রতিদিন টাটকা মুড়ি নারিকেল দিয়া এবং কল বেরোন [অঙ্কুরিত] ছোলা আদা ও গুড় দিয়া খাওয়া উচিত।

আমাদের মনে হয় আরামের একটা কল্পনাই চা-পান বৃদ্ধির অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। আমি, আমার কয়েকজন বন্ধু চা খাইব না বলায় দুধে চিনি ও গরম জল দিয়া তাঁহাদিগকে যেই বলিলাম যে জর্ম্মনি হইতে আগত একপ্রকার সাদা চা আনিয়াছি, তখনই তাঁহারা তাহাতে চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ অনুভব করিলেন, এবং বলিলেন সদ্যসদ্যই তাঁহাদের অম্বল অজীর্ণতা প্রভৃতি ভাল হইয়া গেল। সমস্ত নেশার প্রধান মূল হইল কল্পনা। আমরা আশাকরি তরুণসমাজ চা, সিগারেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

জড়জগতে ও মানবাত্মায় ভগবানের প্রকাশ।

(প্রথম প্রস্তাব)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি ভগবান স্বহস্তে মানবাত্মায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে গুরু হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেছেন এবং আমাদিগকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতেছেন। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি অসংখ্য উপায় বিধান করিয়াছেন। উপদেশের অভাবে ভাল হইতে পারিলাম না, আমাদের কাহারও একথা বলিবার পথ নাই। যদি আমাদের জীবন ভাল না হয়, যদি আমাদের জীবন ধর্ম্মে ও জ্ঞানে আনন্দে ও শান্তিতে ক্রমশ সমুন্নত না হয়, সে দোষ আমাদেরই—সেজন্য আমরাই দায়ী।

আকাশ পৃথিবী জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতির ভাষা কি দুর্ব্বোধ, না অর্থহীন? সত্য বটে ভগবান অতীন্দ্রিয়, কিন্তু জগৎ কি তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার প্রেমের পরিচয় দেয় না? তিনি জড় নহেন সত্য, কিন্তু জড়ের ভিতর দিয়া তিনি নিরন্তর আমাদের নিকটে কি তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন না? মানবাত্মায় কি তাঁহার প্রতিরূপ আমরা দেখি না? বিবেক যে আদেশ প্রদান করে, সে আদেশ কাহার? যে অনন্ত জ্ঞানকে মানবের বুদ্ধি ধারণা করিতে অক্ষম, বুদ্ধি নিজে কি সেই জ্ঞানের একটী ক্ষীণ রশ্মি বলিয়া অনুভব করে না? মানুষের হৃদয় কি সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে এমন একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ পায় না, যাঁহার উপরে একান্ত নির্ভর স্থাপন করিতে পারে এবং যাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতে পারে? যদি আমরা তাঁহার মহিমা ও গৌরব না দেখি তাহার কারণ এই যে আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মের সত্য মানবাত্মায় নিহিত ও বহির্জ্জগতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া যে পৃথিবীতে সাধুভক্তগণের আবির্ভাব অনাবশ্যক, একথা বলা হইতেছে না। তাঁহারা কোন নূতন সত্য সৃষ্টি করেন না বটে, কিন্তু যে সকল সত্য মানবাত্মায় ও বহিঃপ্রকৃতিতে ভগবান স্থাপন করিয়াছেন সাধুভক্তগণের জীবনে ঐ সকল সত্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল আসক্তি ও মোহ আমাদের চক্ষু হইতে ভগবানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মহাজনগণের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষু হইতে সেই আবরণ উন্মোচন করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র এই মহাপুরুষদিগের আপ্তবাক্য। সেই জন্য শাস্ত্রের সমাদর করি। কিন্তু কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নহে। শাস্ত্র আছে বলিয়া আমরা মানবাত্মা ও বহিঃপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। উভয়ই ঈশ্বরের নিত্যলীলার রঙ্গভূমি। যিনি কেবল মনুষ্যলিখিত শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করিবেন, তিনি ভ্রম কল্পনা ও কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

উপরে এই কথাই বলা হইয়াছে যে ভগবানের প্রকাশ দুই স্থানে, প্রথমতঃ বহির্জ্জগতে এবং দ্বিতীয়তঃ মানবাত্মায়। মানবাত্মায় যে তাঁহার প্রকাশ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য; কিন্তু বহির্জ্জগতে তাঁহার প্রকাশ সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা যাইতে পারে।

ভগবান যে অনন্তস্বরূপ, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ঘটনা সেই কথাই ইঙ্গিত করিতেছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ঘটিতেছে, অতি তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকর যে সকল সামগ্রী আমাদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যেও অনন্তের বার্ত্তা নিহিত রহিয়াছে। একখণ্ড প্রস্তরকে শূন্যে নিক্ষেপ করিলে পরমুহূর্ত্তেই যে উহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এই ক্ষুদ্র ঘটনার পশ্চাতে সেই শক্তি বিদ্যমান, যাহা গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ নিজ কক্ষে পরিচালিত করিতেছে এবং নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছে। লোকচক্ষুর অগোচরে গহন অরণ্য মধ্যে যে একটী সামান্য বনফুল ফুটিতেছে তাহার জন্য সূর্য্য এবং পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির কি সমবেত প্রয়াস! এই যে একটী বালুকাকণা, উহা কোথা হইতে কোন্ জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, কোন্ বায়ুর হিল্লোলে উড়িতে উড়িতে কোন্ পথ ধরিয়া কত যুগে যে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে

পে সুদীর্ঘ ইতিহাস কে জানে? সমুদ্র ও পর্ব্বত, উপত্যকা ও অধিত্যকা, নদনদী নির্ঝর, কান্তার ও মরুভূমি—আজ যেখানে যে আকার ধারণ করিয়াছে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের যখন যেরূপ পরিণতি হইবে তাহাও অব্যর্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ভূকম্পের ভীমরঙ্গ, অশনির রুদ্রনাদ, প্রত্যেক বৃক্ষপত্রের স্পন্দন এবং প্রত্যেক অণুরেণুর উত্থান ও পতন—জড়জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ঘটনা অলঙ্ঘ্য কার্য্য-কারণশৃঙ্খলের অধীন ও অতি গূঢ়যোগে সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্বদ্ধ। জড়জগতের সকল বস্তুই আমাদিকে বর্ত্তমানের বাহিরে লইয়া যাইতেছে এবং অনাদি অতীত ও সীমাহীন ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যে অনন্তস্বরূপ প্রকৃতি কোটীকণ্ঠে এই মহাসত্যই ঘোষণা করিতেছে। ইহার অপেক্ষা মহত্তর সত্য পৃথিবীর সাধুভক্তগণ ও স্বর্গের দেবতাগণও ঘোষণা করিতে অক্ষম।

এ জগৎ যে অন্ধ জড় পরমাণুর রঙ্গমঞ্চ বা উদাসীন নিয়তির কর্ম্মক্ষেত্র—মানবের বুদ্ধি এ কথায় সায় দেয় না। বস্তুতঃ প্রকৃতির সকল শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি, প্রকৃতির সকল নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালী, প্রকৃতির সকল কৌশলের পশ্চাতেই ঈশ্বরের জ্ঞানলীলা। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কারণ ভগবান ধীর স্থির অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মে দৃঢ়তা না থাকিত তবে মানবের জীবনযাত্রা নিতান্তই অসম্ভব হইত। আমরা কি এই দৃঢ়তার মধ্যে তাঁহার মহিমা দর্শন না করিয়া বলিব যে ব্রহ্মাণ্ড খাম-খেয়ালীর দ্বারা পরিচালিত হইলে অতি উত্তম হইত?

আবার, বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে সেই বৃক্ষে বীজ জন্মিতেছে উহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বীজের পশ্চাতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের পশ্চাতে বীজ—কি এক অন্তহীন পর্য্যায়! কিন্তু প্রথম বীজই বা কোথা হইতে আসিল এবং প্রথম বৃক্ষই বা কিরূপে উৎপন্ন হইল—এ কি গভীর সমস্যা! বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, যুগ-যুগান্তের পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা Germএর আকারে প্রথমে পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং সেই Germ হইতে কোটী কোটী বৎসরে ক্রমবিকাশের দ্বারা বর্ত্তমানের এই অগণ্য বৃক্ষ-লতা কীট-পতঙ্গ জীবজন্তু ও মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বহু পরীক্ষার পরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জড় হইতে জীবনের উদ্ভব হয় না। জীবনের পশ্চাতে জীবন—এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। ক্ষুদ্রতম কীট ও হীনতম শৈবালেরও সেই সেই জাতীয় কীট ও শৈবাল হইতে জন্ম। তবে পৃথিবীতে কিরূপে জীবনের সঞ্চার হইল অর্থাৎ কোথা হইতে প্রথমে জীবাণুর উদ্ভব হইল—এই সুগভীর রহস্যের উত্তর বিজ্ঞানের অতীত।

যদি আমরা স্বীকার করি যে সেই আদি জীবাণু হইতে ক্রমবিকাশের দ্বারা বহু কল্পে এই বর্ত্তমান যুগের বৃক্ষলতা জীবজন্তু ও মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে যে আর সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিবার প্রয়োজন হয় না—একথা একেবারেই সত্য নহে। কোন একটী কার্য্য যদি অল্প দিনে হয় তাহারই কর্ত্তা থাকে, আর যাহা বহুকাল-সাপেক্ষ তাহার কোন কর্ত্তা থাকে না, তাহা আপনি হয়—এ মত কখনই গ্রাহ্য নহে। বিশ্বাসীর নিকটে ক্রমবিকাশ ঈশ্বরেরই সৃষ্টিপ্রণালী। বিশ্বাসীর নিকটে ক্রমবিকাশের অন্য কোন অর্থই নাই।

মানুষও সেই জীবাণুর পরিণতি বলিয়া যদি মানা যায়, তবে বলিতে হয় যে মানুষের যাহা কিছু—তাহার মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র হৃদ্‌যন্ত্র এবং নিশ্বাসের যন্ত্র, তাহার হস্তপদ চক্ষুকর্ণ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক, তাহার আশা ভয় ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার বাণিজ্য-ব্যবসায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাহার সাহিত্য-সঙ্গীত দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম্ম—এ সমুদয়ও সেই অদ্ভুত বীজাণুর মধ্যে গূঢ়রূপে প্রচ্ছন্ন ছিল। আরও বলিতে হয় যে বাল্মীকি ও বেদব্যাস, গেটে ও সেক্সপীয়ার, সীজার ও আলেকজাণ্ডার, প্লেটো ও শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ যীশু ও চৈতন্য—ইঁহারাও সেই জীবাণুর গর্ভে ভবিতব্যরূপে নিহিত ছিলেন। এই যে জীবাণু, যাহার ক্রমবিকাশ বা পরিণতির কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়—যদি ঈশ্বরকে না মান, তবে কি করিয়া এই জীবাণুর উৎপত্তি হইল ও কেনই বা ইহা এই পরমাশ্চর্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইল এই সুগভীর রহস্যের কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই পরিচয়দান করিতেছে ও তাঁহারই নাম গান করিতেছে, কিন্তু আমাদের চক্ষুকর্ণ থাকিয়াও নাই। অধিকাংশ লোক এই বিচিত্র বিশ্বে সারা জীবন যেন ঘুমাইয়া কাটায়। আমাদের চারিদিকে যে সকল মহাব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় না। এই যে স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ুরাশি যাহা ভেদ করিয়া আমাদের চক্ষু দিগন্তের পানে ছুটিতেছে, এই যে মাথার উপরে সুনীল উন্মুক্ত আকাশ, দিবাভাগের এই যে আলোক-সমুদ্র, নিশীথ অন্ধকারে এই যে অসংখ্য গ্রহতারকার দিব্যজ্যোতি, এই যে জীবধাত্রী দৃঢ়পৃষ্ঠ পৃথিবী, ঐ যে তুষারকিরীট অভ্রভেদী পর্ব্বত, এই যে চির-চঞ্চল সমুদ্রের তরঙ্গলীলা, এই যে নদনদী

নিঃশ্বরের আনন্দধারা, সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের এই যে অন্তহীন রহস্য— ইহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ঐ যে কোটী যোজন দূরবর্ত্তী সূর্য্য, যাহার উপরে পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষলতা ও প্রাণীপুঞ্জের জীবন নির্ভর করিতেছে —যদি আমাদের বিস্ময়ের চক্ষু থাকিত তবে কি প্রতিদিন সেই সূর্য্যের সুগম্ভীর উদয়মুহূর্ত্তে আমরা ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া ভগবানের স্তব করিতাম না ?

রামায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা।*

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

বাল্যকালে যখন পল্লীগ্রামে থাকিতাম তখন দেখিতাম, কাহারও জ্বর-বিকার হইয়া মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে অথবা শিরঃপীড়া হইলে কবিরাজ তপ্ত বালুকার পুঁটুলী করিয়া সেক দিবার ব্যবস্থা করিতেন। পরে যখন কিছু বড় হইয়া নগরে গিয়া দেখিলাম যে সেই অবস্থায় ডাক্তার শীতল জলের পটি অথবা বরফ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, তখন ডাক্তারী চিকিৎসাটা বড়ই বর্ব্বরোচিত বলিয়া বোধ হইত। মন হইতে এই সংস্কার দূর হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। আবার বাল্যকালে যখন হিন্দুসমাজের ছুঁৎবিচার দেখিতাম, তখন অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতিকে("সকড়ি")বড়ই অপবিত্র বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। মুসলমানেরা বিছানায় বসিয়া ভাত খায়—তাহাদের কথা দূরে থাকুক; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা যখন ডালভাত রাঁধিতে রাঁধিতে হাত না ধুইয়া তেল বা ঘৃতের ভাঁড়ে অথবা বস্ত্রাদিতে হাত দিত, তখন তাহাদিগকেও নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিতাম। পরে অধিক বয়স হইলে যখন একজন বুঝাইয়া দিলেন যে, যে অন্ন খাইয়া আমাদের জীবন রক্ষা হয় তাহা ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান দান, সুতরাং তাহা অপবিত্র ইহা ভাবিলেও পাপ হয়। তখন মনে যেন আলোক প্রবেশ করিল এবং স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বাল্যকালের সংস্কারটা কিরূপ যুক্তিহীন ছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই পূর্ব্ব সংস্কারবিরোধী নূতন কোন কথা শুনিলেই আমাদের মনে প্রথমে আঘাত লাগে এবং পরে সেই আঘাতের ফলে আমরা উত্তেজিত হই এবং অনেক সময়ে সেই নূতন কথায় কোন সত্য আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেও পরাঙ্মুখ হই; কিন্তু এরূপ মনোবৃত্তি যে সমীচীন নহে তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। অনুসন্ধান করিলে হয় ত আমরা কখনও কখনও দেখিতে পাইব যে আমাদের পূর্ব্বসংস্কার ভ্রান্ত।

আমি এখানে একই বিষয়ে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রামায়ণে দেখিতে পাই সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস যে, রাম বিবাহ করিয়াছিলেন জনক রাজার কন্যা সীতাকে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র মতে সীতা ছিলেন রামের ভগিনী এবং পত্নী। অর্থাৎ বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে রাম স্বীয় ভগিনী সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া একবার স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ?

জগতে সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। বিবাহ-অনুষ্ঠানেও এই ক্রমোন্নতি হইয়াছে। আদি যুগে বিবাহপ্রথা মোটেই ছিল না, ইহা মহাভারতে উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব্বে নিকট ভ্রাতাভগিনী অর্থাৎ অতি জ্ঞাতির কন্যা-পুত্রে বিবাহ হইত। এই প্রথা যে যদুবংশে প্রচলিত ছিল, তাহা হরিবংশ হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত অতি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়বংশে এই প্রথা ছিল। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার ভগিনী অথবা মাতুল-কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাম অবশ্যই বুদ্ধের বহু পূর্ব্বকার লোক ছিলেন; সুতরাং রামের সময়ে নিকটতর সম্পর্কের নরনারীর বিবাহের সম্ভাবনা ছিল। তাহার পর আমাদিগের ইহা স্মরণ করিতে হইবে, রামায়ণে যখন 'বুদ্ধ' 'শ্রমণ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তখন রামায়ণের রচনাকাল বুদ্ধের পরবর্ত্তী। সুতরাং রামের ঐতিহাসিক বিবরণ রামায়ণকার অপেক্ষা বৌদ্ধশাস্ত্র-প্রণেতারই অধিক জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু রামায়ণরচনার সময়ে হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালের বিবাহের উপরোক্ত রীতির পরিবর্ত্তে উন্নততর বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল। রামায়ণকার রামের ইতিহাসসংকলনের সময়ে রামের এই বর্ত্তমান যুগের অননুমোদিত বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অবশ্যই

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

কুণ্ঠিত হইয়া, অথচ এত বড় একটা সত্য সংবাদ একেবারে অপলাপ না করিয়া লিখিলেন যে, রাম বিবাহ করিয়াছিলেন জনকের কন্যাকে। 'জনক' শব্দের অর্থ যে পিতা ইহা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে আরও একটা কথা বিবেচ্য। রামায়ণে সীতার মাতার উল্লেখ নাই। সীতার জন্মবৃত্তান্ত যাহা রামায়ণে বর্ণিত আছে, তাহা একটা অতি-প্রাকৃত ঘটনা; তাহাতে এই বৈজ্ঞানিক যুগে কেহই আস্থাবান হইতে পারে না। অন্য পক্ষে কৌশল্যা প্রভৃতি তিন জন প্রধান মহিষী ভিন্ন দশরথের আরও ৭৫০ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও গর্ভে সীতার জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। নতুবা সীতার মাতা যে কে ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন?

কেহ কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, রামায়ণই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র পরে রচিত হইয়াছিল; এবং বৌদ্ধরাই তাহার অপকর্ষ সাধন করিয়া রামায়ণ হইতে রামের কথা অপহরণ করিয়া স্বীয় শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মত কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদীরা মানিয়া লইবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং রামায়ণ-মহাভারতে যখন একই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাতে এই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে বৌদ্ধশাস্ত্রের গল্পে কোন সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার, কবিত্ব, চমৎকারিত্ব প্রভৃতি নাই, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতে সেই সেই গল্প কবিত্বময় ও সৌন্দর্য্য-পূর্ণ। এক কথায় বৌদ্ধ গল্প অপেক্ষা হিন্দুগল্প সর্ব্বাংশে ভাল। যাহা ভাল তাহাই পরে হইয়া থাকে। রামায়ণের গল্প শুনিবার পর যদি বৌদ্ধেরা রাম-পণ্ডিতের উপাখ্যান লিখিতেন, তাহা হইলে রামসীতার বিবাহবর্ণনায় তাঁহারা কখনই তাহার অপকর্ষ সাধন করিতেন না।

এ বিষয়ে আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে কোন মত প্রকাশ না করিয়া সুধীবর্গকে ইহার আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করি।

জাতকের অনুবাদক সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "দশরথ-জাতকটা ত একখানি ছোটখাটো রামায়ণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী—কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, কে বলিল রামায়ণ-মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার পাইয়াছিল? ... ... অতএব ইহাই বা না বলিব কেন যে তদন্তর্গত জাতক-সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলি প্রক্ষিপ্ত? যে সমস্ত আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত অসংস্কৃত ও কার্য্যোৎকর্ষ-বর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতই বল বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশই বল, রচনাচাতুর্য্যে ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ... ... মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? ... ... বৌদ্ধ জাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে শ্রোতার ও পাঠকের মনে যদি বিরক্তিরই উদ্রেক হয়, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায় যে, বৌদ্ধেরা রামায়ণ-মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। ... ... বর্ত্তমান রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অসম্ভব।" জাতকের ভূমিকা। ৷৶০ এবং ৮০ পৃষ্ঠা।

জাতক-আখ্যানই যদি সংস্কৃত হইয়া রামায়ণে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামায়ণের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ হয়। এই বিষয়ে এবং রামায়ণের আরও কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রামসীতার বিবাহ ও বৌদ্ধশাস্ত্র

("রামায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা"র প্রতিবাদ)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের সহিত আমরা সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারিলাম না। ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্র বা শাস্ত্রোক্ত বিষয়-সকল ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া যতই আলোচিত হইবে, ততই প্রকৃত সত্যনির্ণয়ের পথ আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই প্রকার আলোচনার স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না, যদিও হয়তো সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা লক্ষ্য রাখিব যে, প্রবন্ধাদিতে কোন প্রকার নিন্দাবাদসূচক কোন কিছু বাহির না হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধও আমরা ঐতিহাসিক গবেষণার সহায়তার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করিলাম; কিন্তু বলা বাহুল্য, লেখকের মতের সঙ্গে—যদিও তিনি তাঁহার মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন নাই—আমরা একমত হইতে পারি নাই; তাই আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লেখক লিখিতেছেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে সীতা রামের ভগিনী ও স্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের এই বিষয়ক পূর্ব্বাপর বা context উদ্ধৃত করিলে এবিষয়ে বিশেষভাবে বিচার করিবার সুবিধা হইত। যাই হোক, সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী ও পত্নী হইবার পক্ষে বিশেষ কোনই বাধা দেখি না। এখানে ভগ্নী বলা হইয়াছে বলিয়া যে সহোদরা ভগ্নী বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ দেখিতেছি না। দশরথও একজন বড় রাজা ছিলেন, জনকও তদপেক্ষা বিশেষ কমদরের রাজা ছিলেন বলিয়া রামায়ণ বা মহাভারত পাঠে বুঝা যায় না। উভয় রাজার মধ্যে কুটুম্বিতাসূত্রে আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব ছিল না, বরঞ্চ সম্ভবই ছিল মনে হয়। সেই আত্মীয়তাসূত্রে সীতার রামচন্দ্রের দূর-সম্পর্কিত ভগ্নী-পদবাচ্য হওয়া আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত ভারতের সাধারণ হিন্দুদিগের প্রণয় যে বড় লঘুভাব ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ not much love was lost between them একথা একপ্রকার সর্ব্ববাদসম্মত। সেই সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্রে যে, সীতা রামচন্দ্রের যে সহোদরা ভগ্নী নয়, সে কথা উল্লেখ না করিয়া তদানীন্তন হিন্দুদিগের বিশেষভাবে পূজ্য রামসীতাকে হেয়-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামচন্দ্রের সহিত সীতার মাত্র ভগ্নী সম্পর্কটুকু উল্লেখ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

লেখক লিখিতেছেন যে, উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে দেখা যায় যে আদিযুগে বিবাহ-প্রথা ছিল না। কিন্তু এই যুগ যে কত পূর্ব্বের তাহা স্থির করাই দুঃসাধ্য। মহাভারত বা রামায়ণের সময়ে এবং উহার পরে এত উচ্চ সভ্যতায় জনসমাজ আরোহণ করিয়াছিল যে, ঐ উপাখ্যানের উল্লেখ করিলে অনেকের বিচারশক্তি রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তারপর লেখক লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে নিকট ভ্রাতাভগিনী অর্থাৎ অতি জ্ঞাতির কন্যাপুত্রে বিবাহ হইত"। এখানে মনে হয় লেখক সহোদরার বিবাহ স্বীকার করেন নাই। তাহা যদি না করেন, তবে আমাদের আপত্তির কোনই কারণ দেখি না। বর্ত্তমানে ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যেও আভিজাত্য রক্ষার জন্য নিকট সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর (cousins) মধ্যে বিবাহ দেখা যায়। সেইরূপ রামায়ণের সময়েও আভিজাত্য-রক্ষা এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য নানা কারণে নিকট সম্পর্কিত cousinsদিগের মধ্যে, কিন্তু সহোদর-সহোদরার মধ্যে নয়, বিবাহ সম্ভবত প্রচলিত ছিল; এবং প্রচলিত থাকিলেও দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। লেখক লিখিতেছেন যে, বুদ্ধের সময়েও অতি সম্ভ্রান্ত বংশে এই প্রথা ছিল। এই প্রথা থাকাই তো সম্ভব। বুদ্ধ তাঁহার মাতুল-কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মাতুল বুদ্ধের মাতার সহোদর ভাই ছিলেন বা অ-সহোদর মাতুল সম্পর্কিত মাত্র ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি বুদ্ধ মাতার সহোদর ভাই ছিলেন না। এ অবস্থায় বুদ্ধের সম্পর্কিত মাত্র মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করায় কোনই দোষ আসিতে পারে না।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা সঙ্গত হইলে, রাম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়ে নিকটতর সম্পর্কের নরনারীর (সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর ইঙ্গিতসূচক) বিবাহের সম্ভাবনা ছিল, লেখকের এই উক্তি যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না।

রামায়ণে যে 'বুদ্ধ' 'শ্রমণ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে তাহাই যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার প্রমাণ কি? রামায়ণে বুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় যদি রামায়ণকে বৌদ্ধশাস্ত্রের পরবর্ত্তী ধরিতে হয়, তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রে রামসীতার বিবাহাদি উল্লেখ থাকায় বৌদ্ধশাস্ত্রকেই বা রামায়ণের পরবর্ত্তী বলিয়া না ধরিব কেন?

লেখক "জনক" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া অর্থাৎ "পিতা" এই অর্থ ধরিয়া সীতাকে দশরথেরই ঔরসজাত কন্যা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। এরূপ সন্দেহ কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জনকরাজের নাম কি কারণে জনক হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এটুকুতো জানি যে, জনকরাজার রাজ্য দশরথের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তথন জনক ও দশরথ একই ব্যক্তি, এরূপ মনে করা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। উভয়ে যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তিই হইলেন, তবে উভয়ের মধ্যে সংবাদ প্রভৃতি আদানপ্রদানের কথা উল্লিখিত হইল কিরূপে? এক ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আমাদের কথালাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তির নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ধরিতে হয়, তবে ধরিতে হয় যে, দশরথের ঠিক দশটাই রথ ছিল এবং শত্রুঘ্ন শৈশব অবধিই শত্রু হনন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর তাহা হইলে লক্ষ্মণ ও ভরত সম্বন্ধে নামের কি ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়?

সীতার মাতার নাম রামায়ণে উল্লিখিত হয় নাই সত্য; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই নাম উল্লিখিত হয় নাই। সীতা হলাগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তো তাঁহার নাম "সীতা" হইয়াছিল। এরূপ প্রসঙ্গ আছে যে, কোন সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ আপন সাম্রাজ্য-গৌরবে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া মুনিঋষিগণের নিকট রাজপ্রাপ্য করের জন্য উৎপীড়ন করেন। উৎপীড়িত ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব জানু বিদারণপূর্ব্বক করস্বরূপ শোণিত প্রদান করিয়া রাবণকে এই অভিশাপ দেন যে, ইহাই তোমার সবংশে ধ্বংস হইবার কারণ হইবে। সভয়ে ও সযত্নে রক্ষিত এই শোণিত রাবণের দিগ্বিজয়কালে মন্দোদরী ভক্ষণ করায়, যথাকালে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। তথন স্বামীভয়ে ভীতা মন্দোদরী আপন জানু চিরিয়া সেই ভ্রূণরূপী রক্তপিণ্ড একটা পাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। ইহাই ভগবদ্ বিধানে কালক্রমে মনুষ্যমূর্ত্তি গ্রহণ করে এবং ভূমিকর্ষণকালে জনকের হলাগ্রে উত্থিত হয়। ইহাতেই তো স্পষ্ট দেখা যায় যে, সীতা আসলে কুড়ানো মেয়ে, জনকরাজা তাঁহাকে সুলক্ষণাক্রান্তা দেখিয়া পোষ্য কন্যা করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র জনকরাজার পোষ্য কন্যা জানিয়াই সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন অনুমান হয়। দশরথের যে তিনজন মহিষীর নাম উল্লেখ করা ঘটনাপ্রসঙ্গে আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, সেই তিন জনেরই নাম রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। যথন উক্ত তিনজন স্ত্রীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তথন দশরথ সীতার পিতা হইলে দশরথের যে স্ত্রী সীতার মাতা ছিলেন, তাঁহারও নামের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত—তাহা না থাকিবার তো কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে রামায়ণ-কথা বিকৃত আকারে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,লেখক মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাথিতেছেন যে, ক্রমোন্নতিবাদীরা উহা স্বীকার করিবেন না। এই মত ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত, সে কথার বিচার এথানে না করিলেও আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি না; কারণ প্রক্ষিপ্ত হইবার মতবাদ স্বীকারে কোন বাধা দেখা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত গল্পের যে সৌন্দর্য্য নাই অলঙ্কার নাই, তাহাই তো আরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রামায়ণ-কথা হইতে সমস্ত বাদসাদ দিয়া নিজের অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত অংশটুকু গৃহীত হইয়া বিকৃত আকারে প্রকাশ করিবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। যাহা ভাল, তাহা যে পূর্ব্বে হইতে পারেই না, এমন কথা বলা বড়ই দুঃসাহসের কথা। রামায়ণের পর বৌদ্ধেরা রামসীতার উপাখ্যান লিথিলে তাঁহাদের

বিবাহবর্ণনার অপকর্ষ সাধন করিতেন না, হিন্দু-বৌদ্ধের কঠোর বিরোধবিবাদ স্মরণ করিলে, যাহার ফলে অনেক হিন্দুজাতি আজ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য পরিগণিত হইয়াছে, লেখকের এই উক্তি স্বীকার করিতে পারি না।

ঈশান বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক পাঠকগণের সম্মুখে বিচারের জন্য ধরিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহার ভিতর হইতে লেখকেরও মত কতকটা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ঈশানবাবু ক্রমোন্নতির উপর দাঁড়াইয়া বলিতে চান যে, যাহা কিছু ভাল তাহাই পরবর্ত্তী। এ কথা আমাদের দেশের বিষয় আলোচনা করিলে বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের সময় বল, অথবা বৌদ্ধরাজা অশোক বা পালবংশের সময় বল, সে সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পরবর্ত্তী বলিয়াই কি এখনকার সমাজকে ভাল বলিতে হইবে? ঈশানবাবু এস্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রের হইয়া একটু ওকালতি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ জাতকগুলি যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা জাতকগুলি পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। সেগুলি অনুমান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই অভিরুচিমত রচিত হইয়া তাহাদিগেরই নিকটে পঠনপাঠন হইত। দেশের মতিগতি অনুযায়ী অর্থাৎ মজ্জাগত apathyর কারণে হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা বা বিবাদ উপস্থিত করা সমীচীন বোধ করে নাই। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের লিখিত হিন্দুবিরোধী অনেক কথা বিকৃত আকারে আবির্ভূত হইলেও বুদ্ধপন্থীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইবার পথ লাভ করিয়াছিল।

মূল প্রবন্ধের প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় যে রামায়ণের ঐতিহাসিক বিষয়ের ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা আহ্বান করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের দুই চারিটী বক্তব্য তাঁহার সমক্ষে এবং পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। অনেক বিষয়েই তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া আমরা দুঃখের সহিত তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, ইহার জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে স্বল্পায়তন পাদটীকায় মতের অনৈক্য প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইব; কিন্তু লিখিবার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখি যে, বিষয়ের গুরুত্বের কারণে এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য বিশদরূপে ব্যক্ত করাই শ্রেয় এবং সেই কারণেই এই প্রবন্ধটী আমরা লিখিলাম এবং পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কাসত্ত্বেও এই সংখ্যাতেই মূল প্রবন্ধের পরেই উহা প্রকাশ করিলাম।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স দ্বারকানাথ

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, কবিভূষণ, কাব্যরত্ন বি-এ)

(১) দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথমবার বিলাত যাত্রা

দ্বারকানাথ ঠাকুর দুইবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। প্রথমবার, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ৯ই জানুয়ারী, রবিবার তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান এবং যাইবার সময় ইটালীর রাজধানী রোম-নগরে গিয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১০ই জুলাই শুক্রবার তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। ১৬ই জুন তারিখে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ গৌরব-লাভ এই প্রথম দেখা যায়। মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের অনুরোধে ইনি তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন এবং ইংলণ্ডের সৈন্য-সম্মেলন (Review) ও রাজ-প্রাসাদের শিশুগৃহ পরিদর্শন করেন। তিনি প্রায় ৪ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সংকল্প করেন যে, ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স দেখিয়া দেশে যাইবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। ইহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি পুনরায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে বিদায় লইবার জন্য "উইণ্ডসর ক্যাসেলে" তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা দ্বারকানাথকে এবারেও যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে তাঁহারা

তাঁহাদের দুইখানি তৈলচিত্র (১) কলিকাতাবাসীগণকে উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা লর্ড ফিটজেরাল্ড দ্বারা দ্বারকানাথকে একখানি স্বর্ণপদক উপহার পাঠাইয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২১ অক্টোবর তারিখে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বদেশ-হিতৈষীতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র সহ একটি সুবর্ণ-পদক উপহার প্রদান করেন। দ্বারকানাথও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

(২) দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার বিলাত যান, তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিবসে টাউনহলে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। (১) এই সভায় গণ্যমান্য য়ুরোপীয় ও বাঙ্গালীগণ উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণও দলে দলে আসিয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রত্যেক রবিবার দ্বারকানাথের টিফিনের অংশভাগী হইয়া সেরি-স্যাম্পেন চালাইতেন, এবং অভাব জানাইলেই দ্বারকানাথ যাঁহাদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই এই সভায় উপস্থিত হন নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সময় সভায় একটি প্রস্তাব উঠিল যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি-স্থানের অত্যন্ত দুর্গতি হওয়ায় তাহার সংস্কার করা উচিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে John Mack, ৩রা জানুয়ারী তারিখের Friend of India পত্রে লিখিয়াছেন, "প্রসিদ্ধ রচনা-লেখক John Fosterএর সহিত আমি যখন তখন দেখা করিতে যাইতাম। তিনি Stapleton Groveএ বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য একজন আসিয়া কিনিয়া লইয়াছে। কবরের চিহ্নমাত্র নাই।" (২) যাহা হউক, মুক্তহস্ত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাতে গমন করিয়া উক্ত স্থান হইতে রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যান এবং "আর্ণোস-ভেল" (Arno's Vale) নামক স্থানে তাহার উপরি একটি মনোহর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (৩)

(৩) ফ্রান্সে লুই ফিলিপ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যান, এবং কয়েক দিন ফ্রান্স-দেশে থাকিয়া কলিকাতায় আসিবার সংকল্প করেন। তৎকালে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। ফ্রান্সেও দ্বারকানাথের আদর ও অভ্যর্থনার সীমা ছিল না। ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি রাজা ও রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফরাসী-দেশীয় রাজগণের প্রথানুসারে আগন্তুক ব্যক্তি কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু লুই ফিলিপ সে প্রথা উলঙ্ঘন করিয়া দ্বারকানাথকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্বীয় মহিষীর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বেলজিয়মের রাজা ও রাণী, নিমুর্শের ডিউক ও ডাচেস্ এবং রাজকুমারী ক্লেমেন্টাইনের সহিত দ্বারকানাথের পরিচয়-দান ও গুণ-কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বারকানাথের সম্মানের জন্য সমগ্র রাজভবন আলোকিত করা হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাবতীয় ঘর ও আসবাব-সামগ্রী দেখাইয়াছিলেন। (১)

---

(১) এই দুইখানি তৈলচিত্র বহু বিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যতক্ষণ না ইহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছিল, ততক্ষণ মহারাণী ইহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে মাননীয় মিঃ মারে কলিকাতায় দ্বারকানাথকে এই বিলম্বের কারণ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উইন্টার বোথাম্ নামক একজন ইংলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর এই দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে টাউনহলে ইহাদিগকে স্থাপিত করা হয়। মনোমতভাবে চিত্র স্থাপিত না হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের Calcutta Star নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্রস্থাপন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ তারিখের Eastern Star নামক সংবাদপত্রে জানিতে পারা যায়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ১লা মার্চ্চ তারিখে টাউনহলে বাঙ্গালী ও য়ুরোপীয়গণ এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, যখন দ্বারকানাথ শীঘ্রই দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করিতেছেন, তখন আমাদের এই ধন্যবাদ পত্রখানি তিনিই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টকে স্বহস্তে প্রদান করিবেন। Friend of India, 5 January 1843, p 10; 4 April, 1844, p, 215; Eastern Star, 2 March, 1845.

(১) Hurkaru 10 Jaauary 1842.

(২) Friend of India, 13 January 1842.

(৩) "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত"। ৩৮৪ পৃঃ

(১) Friend of India, 5 January 1843.

এইখানে বহুদিনের একটি গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জোঁড়া-সাঁকো-পোস্তায় একটি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার পিতা শিবচরণ ঠাকুরই হিন্দু কলেজের প্রথম-দিনের প্রথম ছাত্র। দেবেন্দ্রনাথ রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও আদিব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার নামের ও বয়সের ঐক্য এবং মনের মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, এবং উভয়েই পরস্পর "সখা" বলিয়া ডাকিতেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, তখন পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে থাকিতাম ও তাঁহার পুত্রকে পড়াইতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উভয়ে একত্র বসিয়া "অমরকোষ অভিধান" পড়িতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "আমার সখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একদিন তোমার আলাপ করিয়া দিব"। আমি ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। একদিন তাঁহার সঙ্গে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলাম। পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। দেখিলাম, মহর্ষি বাস্ত-বিকই মহর্ষি। তাঁহার যেমন গুণ তেমনি রূপ। কথাগুলি মধুমাখা। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কথায় কথায় মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা তুলিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া কিরূপ ভাবে থকিতেন ও কি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এই কথা বলিবামাত্র তিনি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া একখানি বই আনিয়া তাহাতে আমার নাম লিখিয়া আমাকে উপহার দিলেন। যতদূর মনে হয়, বইখানির নাম Stockler's Life of Prince Dwarkanath Tagore. এই বইখানি ছোট নহে, বেশ মোটাসোটা। এই বইখানি সুদীর্ঘকাল পরে আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহা এখন অতি দুর্ল্লভ। মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা যখন ফ্রান্সে গিয়া লুই ফিলিপের সহিত দেখা করেন, তখন ফিলিপ বাটীর ভিতরে একটি মনোহর ফোয়ারা দেখাইয়া-ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহা কেমন সুন্দর দেখুন। ফোয়ারা হইতে সুন্দরভাবে জল পড়িতেছে দেখিয়া বাবা আহ্লাদে ও মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, It is exactly like that of my Belgachia villa" দ্বারকানাথের কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি বাল্যকালে বেলগাছিয়া বাগানের যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহা আর এখন নাই। আমি এখানে যাহা যাহা লিখিলাম, তাহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। অগ্রজ-প্রতিম বহুদর্শী এটর্ণী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভঞ্জ মহাশয়ের মুখেও সম্প্রতি ফোয়ারার গল্পটি শুনিয়াছি।

(৪) দ্বারকানাথ ঠাকুরের মল্লযুদ্ধার্থে আহ্বান

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তখন একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন একটি ভোজে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন দ্বারকানাথের এইরূপ আদর ও অভ্যর্থনা দেখিয়া ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বারকানাথ পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অন্য এক প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া ভারতীয় পালোয়ানের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মল্লযুদ্ধ-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সকলেই উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে এই প্রকারে সজ্জিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, "আমাদের দেশের পালোয়ানরা এইরূপ মালকোচা মারিয়া কুস্তি করে"। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইল। (১)

(৫) দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যাত্রা

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ শনিবার দ্বারকানাথ ঠাকুর "বেণ্টিঙ্ক" নামক জাহাজে চড়িয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। তাঁহার এই কয়েকজন সঙ্গী এক জাহাজেই তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন:— দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার র‍্যালে, দিল্লী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রেট্রস, ডাক্তার গুডিভ ও তাঁহার চারিজন ছাত্র—ভোলানাথ বসু, গোপাললাল শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। যাইবার সময় কেইরো-নগরে ইজিপ্টের রাজ-প্রতিনিধি ও নেপল্স্ নগরে ইটলীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরের ২৪শে জুন তারিখে লণ্ডনে উপস্থিত হন। এবারেও তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে মহা সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রাসাদে তাঁহার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারাণীর সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইবার দুর্ল্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। যখন তিনি বকিংহাম প্রাসাদে গমন করেন, তখন মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্ট আপনাদের একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ছবিখানির নিম্নভাগে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন,—To Dwarkanath Tagore with best regards from Victoria R. Albert. Buckingham Palace. July 8. 1845. এই বৎসর স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে গিয়াও

(১) "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত"। ১২ পৃঃ

তিনি বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ জুন তারিখে Duchess of Inverness তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। আহার করিবার সময়ে তিনি কম্প অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে দ্বারকানাথ Sussex সায়ারের অন্তর্গত সমুদ্রকূলে Worthing নামক বন্দরে গিয়া বাস করেন। তখন কিভাবে তিনি দিন-যাপন করিতেন, তৎসম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—"রোগের যন্ত্রণায় বড়ই অশান্তি ও ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী ক'রে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন। তার পর আহার। তাঁহার ভৃত্য হুলির তৈয়ারি কারি ও ভাত, আর একটু কমলা লেবুর জেলি, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একখানি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন। Duchess of Inverness রোজ পত্র দ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর সাময়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না। সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার-ব্যবহারে তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ তিনি পরিধান কত্তেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত; ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটা কাঁচকড়ার তৈয়ারী মসলার ডিপে ছিল। গরম তাঁর আদপে সহ্য হ'ত না। জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফ-জল ভালবাসতেন। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন, কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, I am content অর্থাৎ আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরও অবসন্ন হতে লাগল। তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন।" (১) এই দিনই তিনি Kensal Green নামক স্থানে মহাসমারোহে সমাহিত হন। গোরস্থানের উপরি-ভাগে একখানি রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইয়াছিল। Babu Dwarkanath Tagore, Zemindar, died Ist August 1846, aged 52 years.

(৬) য়ুরোপে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অবস্থান-কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একদিন ফ্রান্সে একটি ভোজে যত সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট কাশ্মীরি শাল উপহার দিয়াছিলেন। যে কেহ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া মুক্তহস্তে তাঁহাকে দান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ সুপুরুষ, সুরসিক ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। •

(১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

• 'বসুমতী' ফাল্গুন, ১৩৩৬

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল)

(৩)

তরু দত্তের নারী-হৃদয়ের সবটা সীতা-চরিত্র অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮৭৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি কুমারী ক্লারিশা বেডারকে লিখিয়াছিলেন,—"সীতার প্রেম হৃদয়কে স্পর্শ করে, এমন নায়িকা কি আর কোথাও দেখা যায়? সন্ধ্যাকালে আমার মাতা যখন পুরাণ পাঠ করেন, তাহা শুনিয়া আমার চক্ষু বাষ্পাকুল হয়। সীতা দ্বিতীয়বার নির্ব্বাসিতা হইলে যখন তিনি একাকিনী নিবিড় বনে নৈরাশ্যময় ও ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে করুণকণ্ঠে বিলাপ করেন, তাহা শুনিয়া কেহ অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।" তরু দত্তের জীবনীপাঠে জানা যায় যে, তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণাদিতে বর্ণিত বহু আখ্যান আজীবন বারংবার শুনিয়াছিলেন ও পাঠ করিয়াছিলেন। শৈশবাবধি ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত মাতার মুখে তরুদত্ত যে পৌরাণিক আখ্যান শুনিতেন, তৎসম্বন্ধে কবির লিখিত পত্রাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার পর তরু ও তাঁহার পিতা পণ্ডিতের নিকট উক্ত গ্রন্থসকল যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ কবির পত্রাদি ও তাঁহার পিতার উক্তি হইতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণোক্ত "রাজর্ষি ও হরিণ-শিশু"র উপাখ্যান ও "ধ্রুবোপাখ্যান" নামে দুইখানি ইংরাজী খণ্ড-কাব্য, যাহা তরু দত্তের রচিত 'হিন্দুস্থানের প্রাচীন ব্যাখ্যা ও কাহিনী'তে স্থান পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কবির পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কবির রচিত "ফ্রেঞ্চ কাব্য-ক্ষেত্রে সংগৃহীত কবিতা-গুচ্ছে"র (Sheaf gleaned In French Field) প্রস্তাবনাতে লিখিয়াছেন,—"আমরা উভয়ে যখন সংস্কৃত-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময়ে তরু কয়েকটি বিষয় ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিল"। ইহার মধ্যে উক্ত "রাজর্ষি ও হরিণ-শিশু"র উপাখ্যান 'কলিকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায়, "ধ্রুবোপাখ্যান" 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তরু দত্তের রচিত উপরোক্ত "কবিতা-গুচ্ছ" ১৮৭৬ সালে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কাব্য-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ভিক্টর হুগোর কন্যার মৃত্যুতে রচিত স্মৃতি-কবিতার টীকায় তরু দত্ত হুগোর বিলাপোক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই কবিতাপাঠে তিন সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার বিলাপোক্তির স্মৃতি জাগিয়া উঠে। টীকায় রামায়ণের মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে :—

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্॥

তরু দত্তের উপর বাল্মীকি ও বেদব্যাসের প্রভাব যে কত বেশী, তৎসম্বন্ধে বিদেশী সমালোচকগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। মাতার মুখে বাঙ্গলা কথা ও পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিয়া আর্য্য-চরিত্র সম্বন্ধে তরুদত্ত যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁহার ভক্তি গাঢ়তর হইলেও আর্য্য-নারীর চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশী সাহিত্যিক ও সমালোচকের মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁহার মনে প্রাচীন ভারতের আদর্শ নর-নারীর কীর্ত্তি-কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ যে তাঁহার প্রতিভাকে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরাসি বিদুষী ক্লারিশা বেডার-লিখিত "প্রাচীন ভারতের নারী" (La Femme dans L' Inde Antique) নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তরু দত্ত উক্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার পিতা ১৮৭৬ সালে পুস্তকখানি ফ্রান্স হইতে তাঁহাকে আনাইয়া দেন। তরু দত্ত এই পুস্তক পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন ও পর বৎসরে গ্রন্থকর্ত্রীকে পত্র লিখিয়া পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তরু মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পুস্তকের ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মিস্ মার্টিনকে তিনি প্রাচীন ভারতের কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"How grand, how sublime, how pathetic, our legends are, the wifely devotion that an Indian wife pays to her husband, her submission to him even when he is capricious and exacting, her worship of him, 'as the god of her life' as old Spenser has it. The legend of Nala and Damayanti, that of Sabitri who followed 'Yama' (Pluto of the Heathen) even to the lower regions, and by her wisdom, her constancy, her love, made him give back to her, her dead husband alive; the legend of Sacontala and Daushmanta; that of Queen Gandhari, who because her husband was blind, put a band on her own eyes, thus renouncing to enjoy a privilege which nature had denied her husband; lest I come to reproach my husband, said she. And last but not least, the sad legend of Ram and Sita."

তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে ক্লারিশা বেডার-লিখিত উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অভাবে ফ্রেডারিক রিচার্ডসন লিখিত "প্রাচ্যের ইলিয়ড্" নামে পুস্তক পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তরু দত্ত বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরাজী ভাষায় শ্রুত পঠিত লিখিত বা অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান হইতে আর্য্যনারীর আদর্শ-চরিত্র সম্বন্ধে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

"আমাদের দেশের নায়িকাগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে অন্ততঃ 'প্রাচ্যের ইলিয়ড' পাঠ কর" একথা যে কবি বলিতে পারেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ভারতবাসী তাঁহাকে হিন্দু কবির আসনে বসাইবে। কুমারী বেডারও আর্য্যনারীর প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি তরু দত্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতের নারীগণকে সর্ব্বাপেক্ষা সাধ্বী ও পূত-স্বভাবা বলিয়াছিলেন। তরু দত্ত যে কেবল প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রেরই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, পুরুষ-চরিত্রের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যের বীর ও করুণ রস তরু দত্তের কবি-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে ফোয়ারার মুখ খুলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার পদ্য ও গদ্যময় ইংরাজি রচনার ভিতর দিয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ভাব-প্রবাহ ইংরাজি-শিক্ষিত পাঠককে দূর অতীতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। মিস্ মার্টিনকে কবি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"Don't you like Lakshmana? I like him immensely, such a bold and intrepid warrior he was. Is not the sad tale of Dasaratha's fault about the hermit youth, whom he killed by accident, beautiful? The description of the feelings of the king, when he discovered that he had killed a human being, instead of an animal, is vivid and thrilling, and the sorrow of the blind old father of the hermit youth is most pathatic. I also like very much the episode about the nuptials of Ganga, 'the fanciful dripping and bright'; and the charming description of the nymph Menaka. Are not Sita's conversations with the old hermitess Anousuya, beautiful? Her description of her own brith and of her marriage with Rama is exquisite."

তরু দত্ত ও তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত সালের ২৫শে নবেম্বর তারিখে তরু মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—

"Pappa and I am going to begin Sanskrit in December; * * * I am very glad of this. I should like to read the glorious epics the Ramayana and the Mohabharata, in the original. I shall be quite a Sanskrit Pundit, when I revisit cambridge!"

১৮৭৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সংস্কৃত আরম্ভ করিয়াছি। শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন"। বাল্মীকির রামায়ণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা অন্য কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে, এই সকল পুস্তকের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ তাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—

"We are going on with our Sanskrit lessons. When we have finished the book we are reading now, we will take up Valmiki's Ramayana. My uncle has followed our example and has commenced reading Sanskrit also, with another pundit."

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে সংস্কৃত ভাষার রীতিমত চর্চ্চা রামবাগানের দত্ত কবিদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তরু দত্ত ও তাঁহার পিতার শিক্ষক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আলোকনাথ পণ্ডিতের নিকট রামবাগানের দত্ত-বংশের হিন্দুশাখার ঈশানচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রদ্বয় যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা রমেশ চন্দ্র দত্ত আই-সি-এস, মহোদয়ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে তরু দত্ত ও তাঁহার পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দত্ত কবিদের মধ্যে যে ভারতের প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছিল, ইহা তরু দত্ত লিখিত উপরোক্ত পত্রাংশ পাঠে বুঝা যায়। ইংরাজী শিক্ষার যে প্রবল স্রোত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে বহিতেছিল, তাহাকে বাধা দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকগুলি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের অমর কবি যেদিন সংস্কৃত ভাষা রীতিমত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত আর্য্য আদর্শের প্রভাব নূতন আকারে দেখা দিয়াছিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের হৃদয়ে পূর্ণ সংস্কার সংস্কৃত ভাষার প্রসাদাৎ জাঁকিয়া বসিলে কবির অন্তর্দৃষ্টি বঙ্গ-ভারতীর কবিত্বময়ী যে মূর্ত্তি পাশ্চাত্য মাল-মসলায় গঠিত কাব্য-মন্দিরে চিরকালের তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাই এদেশের হিন্দুগণের পাশ্চাত্যের প্রভাব হইতে বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে শুধু রক্ষা করে নাই, তাহাকে দেশাত্মবোধের দিক দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই যে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। সেই কাব্যসাহিত্যের অবয়ব বিদেশী আহার্য্যে পরিপুষ্ট হইলেও তাহার প্রাণবস্তু যে হিন্দু আদর্শ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মধুসূদন আধুনিক বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মহিলা-কবি তরু দত্তও ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্যের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্যের সাহিত্য-জগতে প্রাচীন ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য মোহীকে বিদেশী প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে যেদিন তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিনও বঙ্গদেশের কাব্যজগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মধুসূদন ও তরু দত্তের কবি-জীবনে ভারতের দেবভাষা নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। মৃত সংস্কৃত সাহিত্যের কঙ্কালগুলি পরীক্ষা করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের বালখিল্য সভ্যতা ভারতের প্রাচীন অতিকায় আর্য্য সভ্যতার তুলনায় নগণ্য হইলেও জীবন্ত। সেইজন্য জীবন্ত পাশ্চাত্য-সাহিত্যকে নিঙড়াইয়া তাঁহারা যে মৃত-সঞ্জীবনী রস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাহা ছিটাইয়া দিয়া অতীতের বিস্মৃতি হইতে পুণ্যভূমি ভারতে উচ্চতম আদর্শকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার পটে পূর্ব্বপুরুষগণের ছায়া-চিত্র দেখিয়া মধুসূদন ও তরুদত্তের প্রতিভা বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার পটে যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহাতে চিত্রকরের অতুলনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তরু দত্তের রচিত চিত্রগুলির ভাষা-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভ্রান্ত সমালোচনা তাহাদিগকে বিদেশী আদর্শে রচিত মনে করিতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় যে "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের ভাষা-পরিচ্ছদেও স্থূলদৃষ্টি কয়েকজন বাঙ্গালী সমালোচক কবির উপর বিদেশী প্রভাব দেখিয়াছেন। বিদেশী আর্ট কি তাহা হইলে মধুসূদন নিজস্ব করিতে পারেন নাই? এড্‌মন্ গস্ (Edmund Gosse) প্রমুখ বিদেশী সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তরু দত্তের চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হিন্দু আদর্শে রচিত। বিদেশী সমালোচক ইংরাজী ভাষার কবি তরু দত্তকে "হিন্দু কবির আসনে" বসাইতে চাহেন, কিন্তু বাঙ্গালী সমালোচক বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদনকে সে আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বিস্ময়ের কথা বটে!

বিভুগুণ গাও।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(বাউলের সুর)

বিভুগুণ গাওরে প্রাণপাখী
দারা-সুত যত কিছু সবাই দেবে ফাঁকি ॥
তাঁরে ছেড়ে আর ডাকবি কাকে—
নিতুই প্রাণে যে দেব জাগে?
রোস নে সরে আপন জাঁকে—
কি মধু সে দেখ্‌রে ডাকি।
মধুর সিন্ধু পায়, যে ডাকে—
কষ্ট পেতে হয় না তাকে;
আনন্দে সে বিভোর থাকে—
দেবতা রাখেন পক্ষে ঢাকি।
আকাশ-পথে রইবি জাগি—
গান গাবি রে থাকি-থাকি;
তখন তোরে বেঁধে রাখে—
দেখতে কারেও পায় না আঁখি ॥

সুখদাসুন্দরী অমৃতধামে।

আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পরলোকগত সহধর্ম্মিণী ৺সুখদাসুন্দরী দেবীর জীবনকথা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে সাদরে প্রকাশ করিলাম। ভগবান তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করুন।

"পাতিব্রত্য ও সতীত্বের মূর্ত্তি সুখদাসুন্দরী ইহজগতে নাই। তিনি অমৃতধামে গিয়াছেন, আর তাঁহার স্বহস্তগঠিত সারস্বত কুটীর এখন গভীর শোকাভিভূত। সকল সম্প্রদায়ের পল্লীবাসী নরনারী তাঁহার বিয়োগে ম্রিয়মাণ। শিলচর সহর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা ৺নয়নচন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ।

সুখদাসুন্দরী শিলচর বঙ্গবিদ্যালয় হইতে আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আসাম গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ৩৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে শ্রীহট্ট জেলায় বেজুড়া-গ্রামনিবাসী কাশ্যপগোত্র ৺যাদবেন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ও ৺ব্রজনাথ মজুমদারের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বিবিধ কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন।

তিনি চরকায় সুন্দররূপে সুতা কাটিতে পারিতেন। আসাম গবর্ণমেন্টের বয়ন-পরিদর্শক তাঁহার কাটা সুতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মোজা প্রভৃতি এবং কোট সেমিজ প্রভৃতি কাটা কাপড় সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বাঁশের ঝুড়ি ফুলের সাজি নির্ম্মাণ, সুপারির খোল হইতে ডালা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পকার্য্যেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যাহা শিখিতেন, পল্লীবাসী অপর সাধারণকেও তাহা শিখাইতে ভালবাসিতেন। তিনি চিত্রশিল্পেও সুনিপুণ ছিলেন।

কেবল যে চারুকলায় তিনি দক্ষ ছিলেন তাহা নহে, রন্ধনাদি কার্য্য, মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য কর্ম্মেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রাচীন সুগৃহিণীদের অনুকরণে পরিবারের সকলের এবং অতিথি-অভ্যাগতদের আহারাদি শেষ হইলে নিজে আহারে বসিতেন।

সর্ব্বোপরি, তাঁহার ধর্ম্মভাব আশ্চর্য্য ছিল। তিনি "লেস" ডালা প্রভৃতি যাহা কিছু বুনন করিতেন, সকলেতেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ভাব সেই একে" প্রভৃতি ধর্ম্মভাবসূচক কোন একটী বাক্য না প্রকাশ করিলে তৃপ্তিলাভ করিতেন না।

তিনি অজাতশত্রু ছিলেন; কাহারও সহিত তিনি বিবাদ-কলহ করিতেন না। তিনি সকলেরই প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন।

গৃহের কোন কর্ম্মই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। দাসদাসীর উপর নির্ভর না করা সত্ত্বেও সকল কর্ম্মই স্বয়ং যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিতেন। স্বাবলম্বনই তাঁহার গৃহস্থালীর মূলমন্ত্র ছিল।

তিনি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিয়মিত উঠিয়া নিজের কাজকর্ম্ম সারিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদিগকে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। ভোগবিলাস বা ধনসম্পদের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। নিয়মিত ও শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্ম করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। নিয়মের উপর চলিতেন বলিয়াই তিনি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত অবধি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার অবসর পাইতেন।

দর্শন আলোচনার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ স্থানীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইত।

আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" পড়িয়া তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আচার্য্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপে বেজুড়াগ্রামে "ক্ষিতীন্দ্র লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি অচল বিশ্বাসের বলে তিনি সংসারের অনেক ঘাতপ্রতিঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন।"

ভূমিদান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫২৮১৮১৫৯ নম্বর মহাল সানন্দরায় রায়মজুমদার হইতে ১৫ নম্বর খারিজ পৃথক হিসাব প্রসন্ন কুমার মজুমদার মহালের অন্তর্গত অৰ্দ্ধ বিঘা ধানীজমি রকম ভূমি দান করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ঐ ভূমির আয় সমাজে প্রেরিত হইবে। ঐ ভূমির বার্ষিক খাজানা এক টাকা। সমাজের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ সংরক্ষণার্থ এককালীন কিছু অর্থ দান না করিয়া ভূমিদান করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	২৫৲

উৎসবের দান।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	১৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু	১৲
শ্রীতুলসী দাস দত্ত	২৲

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

ছবি

(সঙ্গীত ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. Ind. কর্ত্তৃক স্বরলিপি সহ)

রয়াল ৪ পেজী ১+১১৬ পৃষ্ঠা ; ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট ; প্রচ্ছদে ও মুখপত্রে দুইখানি ভাবোদ্দীপক চিত্র সম্বলিত।

এই গ্রন্থে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সর্ব্বপ্রকার উচ্চাঙ্গের ৫০খানি বাছা বাছা গান দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গান বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান ও লয় সমন্বিত। গানগুলি তান ও লয় সহকারে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলির ভাব যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি মনোহর। গানগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল-লয়ে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গীতরসজ্ঞমাত্রেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির হাতের নিকটে রাখিবার যোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগ হইতে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে গ্রন্থখানি ক্রমোন্নতিযুক্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে প্রাভাতিক ও সান্ধ্য ৩৩টী বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী এবং ১৮টী বিভিন্ন তালের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা এবং মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়ে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

"এই গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ৫০টি সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র "ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্তু" এই গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদুষী শ্রীমতী বাণী দেবী কল্যাণ ঠেকা সুর-তালে ঐ মন্ত্রের বল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদগান সকলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

"বাণী দেবী স্বয়ং সুন্দর গান করিতে পারেন, সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী, গানের স্বরলিপি রচনায় সুনিপুণা। পিতা ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, কন্যা সুর তালে তাহা গাহিতেছেন। ভারতের প্রতি গৃহে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মানবকুল পুণ্যালোকে পরিপূরিত হউক—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' নীচ আমোদপ্রমোদ বর্জ্জন করুক।"

সঞ্জীবনী—৬ই চৈত্র, ১৩৩৬।

Bandhu Amar—(My Friend.) By Kshitendra Nath Tagore, (Adi Brahmo Samaj Press, Calcutta, Re. 1/.)

This is a book of prayer. Mr. Tagore, the Minister of the Adi Brahmo Somaj, is known as a saintly man. In this book he has embodied thirty-one of his prayers to the Almighty whom he looks upon as his friend. Their beauty cannot be realized except by those who in time of distress seek relief and comfort by prayer To them the book will be very helpful.

Statesman 9. 3 30.

KHEAL OR RANDOM THOUGHTS.—BY KSHITINDRA NATH TAGORE.

(Adi Brahmo Samaj Press. Rs. 1–8.)

Mr. Tagore has earned a reputation as an essayist. This Volume contains a systematic chain of thoughts about men and things that came to him during his travels on four different occasions; and the descriptions incidentally offer opportunities for the reader to make himself acquainted with the manners and customs of the well-known Tagore family of Calcutta. The most noticeable feature of the book is the author's eagerness to induce his readers to look even at the ordinary things around them in a spiritual way. The book will be welcomed by all who enjoy deep thinking. Statesman 23. 3. 30.

প্যারিসের কেমিষ্ট মিঃ জে, চক্রবর্ত্তী,
বি-এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন) এম, সি, এস (প্যারিস) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত
ফুলেলিয়া

"ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল"

কেশতৈল ও সুগন্ধ।

ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল—ভৃঙ্গরাজ ও ক্যান্থারাইডিন যুক্ত কেশ টনিক ও কেশ তৈল। সকল "কেশরোগের" মহৌষধ। ১৲

ফুলেলিয়া অয়েল—মহাসুগন্ধ সৌখিন কেশতৈল। ১৲

ফুলেলিয়া নারিকেল তেল—বিশুদ্ধ ভেজালহীন, সুরভিত, সুলভ, নিত্যব্যবহার্য্য। বড় বোতল ১৷৵০

ফুলেলিয়া তিল তেল—নিজেদের তত্ত্বাবধানে কাঁচা কৃষ্ণ তিল হইতে প্রস্তুত হয় মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয়। মনোহর গন্ধ। ৸৵০

"সুইট হর্ট" (Sweet Heart)—বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মনোহর শিশিতে সুরাসার-বর্জ্জিত কুসুমনির্য্যাস। এক ফোটা রুমালে দিলে গন্ধ কয়েক দিন থাকে। ২৲

ফুলেলিয়া অটো—"রোজ" সুন্দর পকেট ঘড়ির আকারের শিশিতে ঘনীভূত গোলাপ গন্ধ। ১৷৹

ফুলেলিয়া অটো—"জেসমিন" মনোহর গোল শিশিতে দ্রবীভূত-যুঁই ফুল। সুরাসার বর্জ্জিত। গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী। ১৷০



ফুলেলিয়া পারফিউমারী কোম্পানী,
(শোরুম ও অফিস) ১৭।১ মৃর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, (কলেজস্কোয়ার দক্ষিণ)

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়া শত-সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমি অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে W. C. Ray আবিষ্কৃত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তাঁহার উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহা ব্যবহার করিতেন এবং তাহা অগ্নিতে জলের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি—

৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
১০।১২।২৪

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

(বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা)

৬ষ্ঠ বর্ষ

সম্পাদক— { সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক :—ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস) }

যাঁহারা ঘরে বসিয়া ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি সকল অঙ্গের গান শিখিয়া ওস্তাদ হইতে চান, যাঁহারা সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে পারদর্শী হইতে চান, যাঁহাদের বালকবালিকাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে চান, অতি আধুনিক বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি লিখিতে চান, তাঁহারা আজই এই পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

বার্ষিক মূল্য ৩৸০। প্রতি সংখ্যা ।৵০ মাত্র।

কর্ম্মকর্তা

৮সি লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
